আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা
সপ্তম বই

জাপানী বন্দী-শিবিরে

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

আড়াই টাকা

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
মুদ্রাকর—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিমিটেড
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

স্বর্গীয় পিতৃদেব

সুরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত

১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর সহরে আমরা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হই। তারপর প্রায় দেড় বছর জাপানীদের কাছে বন্দী থাকার পর, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করি। এই দেড়টি বছর জাপানীদের সঙ্গে যেভাবে কাটিয়েছি তাই লিপিবদ্ধ করেছি এই বইয়ে—এটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা। বন্দীদের মধ্যে অনেকে ভাগ্যক্রমে খুব কম কষ্টই পেয়েছেন আবার অনেকে খুব বেশী কষ্ট পেয়েছেন! কাজেই আমার লেখা পড়ে যেন কেহ মনে না করেন যে, এইটিই জাপানীদের ব্যবহারের মাপকাঠি!

শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু এবং প্রকাশক শচীনবাবুর অক্লান্ত চেষ্টা ও আগ্রহের জন্যই, বই ছাপা সম্ভবপর হো'ল! এঁদের দু'জনকেই বন্ধুভাবে পেয়েছি—কাজেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে—বন্ধুত্বকে ম্লান করতে চাই না!

—লেখক

জাপানী বন্দী শিবিরে

সিঙ্গাপুরে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

কয়েকদিন থেকেই জাপানী ও বৃটিশ—দুইপক্ষের কামানগুলি ঘন ঘন গর্জন করে তাদের বিশ্বধ্বংসী গোলাবর্ষণ করছে। সেই ভীষণ শব্দে প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে কানের পর্দাগুলি এই বুঝি ফেটে গেল। আশেপাশে চারদিকেই ভীষণ শব্দে ঘন ঘন কামানের গোলা ফেটে পড়ছে। আহতদের আর্তনাদ, ভয়ার্তদের ইতস্তত ছোটাছুটি, আর যারা চিরদিনের জন্যই এ সংসারের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে তাদের বীভৎস মূর্তি—সব কিছু মিশিয়ে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে, এই বোধহয় প্রকৃতপক্ষে নরকের দৃশ্য।

সারা আকাশ ছেয়ে গেছে জাপানীদের বিমানে। মাঝে মাঝে বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে তারা নীচে নেমে আসছে; প্রাণভয়ে সকলেই আশ্রয় নিচ্ছে মাটীর নীচে গর্তে অথবা বড় বড় বাড়ির মধ্যে। হত্যার এক বিরাট বিভীষিকাময় মূর্তি নিয়েই প্লেনগুলি নীচে নেমে আসছে। তাদের ইঞ্জিনের ঘর্ঘর ধ্বনি, মেশিনগানের টিক টিক শব্দ নীচের অসহায় ভয়ার্ত নর-নারীর বুকে যেন ভারী লোহার হাতুড়ি পিটছে। বিপদের চাইতে বিপদের ভয়টাই বেশি, মৃত্যুর চাইতে মৃত্যুভয়টাই ভয়াবহ। চারিদিকে আর্তনাদ, প্রাণভয়ে ছোটাছুটি শুধু মানু-

যেরই নয়, এমন-কি গৃহ পালিত কুকুর-বিড়ালগুলিও ভয়ে ভয়ে মানুষের অনুসরণ করছে, গর্তের নীচে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। তারপর প্লেনের মেশিনগান থেকে টিক টিক শব্দে ছুটে আসছে অবিশ্রান্তভাবে অসংখ্য অগ্নিশেল। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু গুলী আর গুলী। মাঝে-মাঝে বাজ পড়ার শব্দকেও হার মানিয়ে ভীষণ শব্দে ফেটে উঠছে বোমা। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার, তারপর শুধু আগুন আর আগুন। তার লেলিহান শিখা আকাশের দিকে মুখ বাড়িয়ে যেন আনন্দে মেতে উঠছে। ক্রমে ক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে— হয়তো কোনও পেট্রল ডাম্পের আগুন। ভয়ে সকলের মুখ ফ্যাকাশে।

আমাদের হাসপাতালের বড় সিঁড়িটার নীচে প্রায় সব দেশের লোক আশ্রয় নিয়েছে। একজন গোরা—মাঝে মাঝে প্রলাপের মতো চীৎকার করছে—"Where's God? Where's Christianity?" অন্যান্যরা আপন মনে বিড় বিড় করে হয়তো নিজ নিজ ভাষায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে এ যাত্রায় প্রাণটা বাঁচাবার জন্য। প্লেনের শব্দটা একটু দূরে মিলিয়ে গেলেই ভয়ার্ত ফ্যাকাশে মুখগুলিতে একটু একটু করে রক্তের সঞ্চার হয়, মাথা তুলে কান পেতে শোনে দূরের আওয়াজ। তারপর নানা সম্ভব অসম্ভব স্থান থেকে বেরিয়ে আসে অনেকগুলি প্রাণী। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "যাক এবারটা রক্ষা পাওয়া গেছে।" আবার মুখে রক্তের ঝলক

দেখা দেয়, অধরে ফুটে উঠে হাসির রেখা। ধূমপায়ীরা মহানন্দে কয়েকটি দমে একটি সিগারেট নিঃশেষ করে খুব আরামের সঙ্গে মুখভরা ধোঁয়াটা বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে আলোচনা শুরু করে—কোথায় ফাটলো বোমাটা? প্লেনগুলি চলে যাওয়ার পর সকলেই যেন অতি মাত্রায় সাহসী হয়ে পড়ে। বলে, আমি তো মাথা তুলে দেখেছি বোমাটা পড়েছে ঠিক "র‍্যাফেল স্কোয়ারের" পাশেই। কেউ বলে, না বোমাটা তো পড়েছে ঠিক আমাদের থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে। তারপর শুরু হয় নানা তর্ক। কতগুলি প্লেন ছিলো এই ঝাঁকে। কেউ বলে একুশ, কেউ সাতাশ, আবার কেউ বলে পঞ্চাশ। অথচ আক্রমণের সময় মাথা তুলে ক'জন যে প্লেন গুণেছে সেটাই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন।

যারা এদিকে ছিলো, তারা এ যাত্রায় গেলো বেঁচে! যারা ওদিকে ছিলো অর্থাৎ বোমাটা যেদিকে ফেটেছে, সেদিকে যা ক্ষতি হয়েছে, তা হয়তো অনেকেরই ধারণার অতীত। এতক্ষণে সেখানকার হাহাকারের রবে আকাশও হয়তো কেঁদে উঠেছে। যারা বেঁচেছে তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে অপরকে বাঁচাবার জন্য! গৃহহারা ছুটেছে নূতন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে, আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আগুন নেভাবার চেষ্টা হচ্ছে। আর যারা আগুনের মধ্যে আটকা পড়েছে তাদের অর্তনাদ লক্ষ্য করে অনেক নির্ভীক বীর ছুটে চলেছে তাদের উদ্ধার করার জন্য। আগুনের লেলিহান শিখা যম-দূতের নির্মম প্রহরীর মতই মানুষের প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ

করে তার নিজের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। একদিকে ধ্বংসের বিচিত্র আয়োজন, অন্য দিকে অসহায় মানুষের আত্মরক্ষা ও আহত এবং দুর্গতদের সাহায্য করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা। সবলের আক্রমণ থেকে দুর্বলের আত্মরক্ষা? কিন্তু একমাত্র ভগবানের নাম ছাড়া অন্য কি অস্ত্র আছে আত্মরক্ষার?

৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপানীরা সিঙ্গাপুর দ্বীপে অবতরণ করার পর থেকেই এইভাবে যুদ্ধ চলেছে। মনে পড়ে ছাত্র-জীবনে "All quiet on the Western Front"-এর ছায়াচিত্র দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম। যুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলাম ঐ ছবিখানা দেখে। সেদিন কি একবারও ভেবে-ছিলাম যে, আমার জীবনে সত্যই একদিন শুনতে পাবো আধুনিক যুদ্ধযন্ত্রের ঝনৎকার, চোখের সামনে দেখতে পাবো বাস্তব যুদ্ধ? আজ বাস্তব জীবনে যুদ্ধের প্রকৃত ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সেদিনের সেই ছায়াছবি ছেলেখেলার মতই মনে হচ্ছে।

অপ্রতিহত ভাবে জাপানী বিমানগুলি আকাশ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে। বিমানধ্বংসী কামানগুলি নীচে থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করা সত্ত্বেও যাদুমন্ত্রে রক্ষিত অক্ষয় কবচধারীর মতো জাপানী বিমানগুলি অবলীলাক্রমে সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশের বিমান-গুলি হঠাৎ যেন ভোজবাজির মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছে। সকলেই নিজের নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে

দুর্বলের সহায় ভগবানের নাম নিচ্ছে। মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনই মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, সে কতখানি অসহায়। কারণ ঐ মৃত্যুর কাছে তাকে মাথা নত করতেই হবে, যতই সে বিজ্ঞান গর্বে গর্বিত হোক না কেন।

খবরের কাগজে বহুবার পড়েছি, সিঙ্গাপুর দ্বীপটি খুবই সুরক্ষিত। বৃটিশ সিংহ বহুবার গর্জন করে বলেছে, "Singapore is the Gibraltar of the East"—বহু সৈন্য সমাবেশ দেখে ও এখানকার নৌঘাঁটির নানা চমকপ্রদ খবর শুনে আমাদের মনেও ধারণা হয়েছিলো যে, জাপানীরা খুব শীঘ্র মালয় জয় করলেও সিঙ্গাপুর অধিকার করতে তাদের নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আট তারিখে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করার পর থেকে তারা যেভাবে যুদ্ধ করছে এবং যেরকম বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে আসছে, তাতে আমাদের পুরানো ধারণা একেবারেই ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ভীষণভাবে হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে, বহু সামরিক ও বেসামরিক লোক হতাহত হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেরকম দ্রুতগতিতে তাদের 'Moral' হারিয়ে ফেলছে তাতে এখানকার যুদ্ধের ফল যে কি হবে তা বেশ স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে। শত শত ভীত কাতর কণ্ঠে শুধু এই প্রার্থনাই শুনেছি এভাবে আর সহ্য করা যায় না, শীঘ্রই এ যুদ্ধের অবসান হোক।

এইরূপ আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যতোটা সম্ভব সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমাদের হাসপাতালের কাজ চলছে।

সমুদ্রের প্রায় তীরেই "Union Jack Club"-এ আমাদের হাসপাতাল অস্থায়ীভাবে কাজ করছে। যতোদূর সম্ভব চেষ্টা করেও আমরা প্রত্যেক রুগীর সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারি নি। সত্যি বলতে গেলে, তা ছিলো একেবারেই অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তেই অ্যাম্বুলেন্স বোঝাই আহতেরা হাসপাতালে এসে পৌঁছাচ্ছে। তার মধ্যে কতকগুলি মৃত, আর কতক আসছে যাদের আয়ুর প্রদীপ নিবু-নিবু, কিন্তু প্রাণটুকু এখনো ধুক ধুক করছে। কারো বা গোটা হাত বা পাখানাই উড়ে গেছে, কারো বা দেহ থেকে বোমার টুকরো মাংস উঠিয়ে নিয়ে এক বিরাট বীভৎস ক্ষতের সৃষ্টি করছে। কারো কারো সারা দেহ আগুনে ঝলসে গেছে। এদের সুবন্দোবস্ত শেষ হতে না হতেই আবার অ্যাম্বুলেন্স বোঝাই আহত লোক এসে পৌঁছাচ্ছে। অনেককে বাইরের মাঠেই রেখে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা।

অবস্থা খারাপ জানতে পেরেই আমাদের কর্তৃপক্ষ মিলিটারী হাসপাতালে যে সমস্ত নার্সেরা কাজ করতেন, তাঁদের বারো তারিখে জাহাজের পথে ভারতের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু'দিন আগে Medical Auxiliary Service এর ছয়জন চীনা নার্স, যাঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাদের কাজে সাহায্য করতে এসেছেন। সেবার কাজে এঁরা বেশ নিপুণ। পেশাদার মিলিটারী নার্সদের সঙ্গে এঁদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেবা করে আনন্দ পাবার জন্য—নিজেরা ধন্য হবার জন্যই এঁরা এসেছেন সেবিকার কাজে। আর মিলিটারী

নার্সেরা, এসেছেন তাঁদের উচ্চ পদবী ও মোটা মাহিনার লোভে। বৃটিশ মিলিটারীর প্রত্যেক নার্সই হচ্ছেন অফিসার। অবশ্য এঁদের মধ্যেও যে দু'চারজন খুব প্রশংসনীয়ভাবে সেবার কাজ না করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

চীনা নার্সদের মধ্যে একজন নিতান্ত বালিকা, আমার সঙ্গে একই ওয়ার্ডে কাজ করছিল। সে তার দুঃখপূর্ণ জীবনের কতকটা কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলো। বড়লোকের মেয়ে স্কুলে লেখা-পড়া করছিলো, বাপ-মা জাপানীদের ভয়ে দেশছাড়া হয়েছেন, কিন্তু দুষ্টু মেয়েটি তাঁদের অবাধ্য হয়েই হাসপাতালে কাজ করার জন্য এখানে রয়ে গেছে। নিরুপায় হয়েই বাপ-মা পালিয়েছেন হয়তো ভারতবর্ষে অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে, মেয়েটিকে এখানে কোনও আত্মীয়ের কাছে রেখে। তারপর অবস্থা যখন আরও খারাপ হয়ে এলো, তখন গভর্ণমেণ্ট এই নার্সদেরও দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সর্ত ছিলো, তাদের বিনা ভাড়ায় ভারতবর্ষে অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। তারপর সেখানে চাকুরী যোগাড় করে অন্ন-সংস্থান করার ভার তাদের নিজেদের উপর। এমনি অসহায়ভাবে নারীর পক্ষে বিদেশ যাওয়া মোটেই লোভনীয় নয়, কাজেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে থাকাই তারা উচিত বিবেচনা করেছে। চীনারা বেশ ভালো করেই জানে যে, জাপানীরা দেশ অধিকার করার পর তাদের উপর চলবে অত্যাচারের স্রোত। সব শেষ করে বললে, "আমি দুষ্টু মেয়ে, তাই এমন করে বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কাজেই সব

কিছু বিপদের জন্যই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।” কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের কোণে দেখা দিল দু'ফোটা অশ্রু। বিপদ যে তার কতখানি, তা উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু একটু-খানি সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিই-বা করতে পারি আমি? মেয়েটির নিপুণ হাতের সেবা পেয়ে অনেক রুগীই ধন্য হয়েছে, আর উচ্ছ্বসিতভাবে করেছে তার কাজের প্রশংসা।

হাসপাতালের কাজ যথানিয়মে চলেছে। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে একটুখানি দুঃখ কষ্টের কাহিনী। দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অসহায় নরনারীর প্রাণের বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের চেহারায় কথাবার্তায় ও ভাবভঙ্গীতে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ এইভাবে কেটে গেলো। মুহূর্তগুলিও যেন আর কাটতে চায় না, মিনিটকে যেন ঘণ্টা বলেই মনে হচ্ছে। দুঃখ কষ্টের সময় কিছুতেই কাটতে চায় না, অথচ আনন্দ ও সুখের সময় কত শীঘ্র শেষ হয়ে যায়।

বেলা তখন প্রায় চারটে। দোতলায় রুগীদের কাজে ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ বোমা ফাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িখানা যেন ভূমিকম্পের ঝাঁকানির মতো ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ, হাহাকার ভয়ার্তদের চারিদিকে ছোটাছুটি, কানে সব কিছু আওয়াজ এলেও কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একেবারে যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম। কি করা উচিত সব কিছু ভুলে গিয়ে সেখানেই মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে কতকটা স্থির হতেই চেয়ে দেখি সকলেই নীচের দিকে ছুটেছে আমিও তাদের

অনুসরণ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলাম। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে দেখি, সেদিককার একটা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে সিঁড়ির উপর। পাশ দিয়ে কোনক্রমে নীচে নেমে এলাম। সামনের গেট দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করে দেখি—সেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সকলেই চারদিকে ছোটাছুটি করছে, অথচ কোথায় কে যাবে জানে না। পিছনের দিকে অনেকগুলি বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালা ছিলো। অনেকে সেখান দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় অনর্থক ছোটাছুটি করছে। মাত্র চারদিন আগে টারসেল পার্কে বারো নম্বর ভারতীয় হাসপাতালটি চোখের সামনে জ্বলে যেতে দেখেছি, কাজেই আজকে মনে সাহস সঞ্চয় করে রুগীদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলাম! ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে পিছনের দিকে রাস্তায় কতকগুলি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে। রুগীদের ষ্ট্রেচারে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে পাঠানো হতে লাগলো। এইভাবে সারা হাসপাতালের সকল রুগীকেই অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্লেনগুলি এখানে কর্তব্য শেষ করে, অন্যত্র কর্তব্যের আহ্বানে চলে গিয়েছে। কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সিং সিপাহী রাস্তায় হোস পাইপ খুলে বাইরের আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে কয়েকজন রুগী ছিলো, তারা জীবন্ত পুড়ে যাওয়াতে, একটি দুর্গন্ধ আসছে। বাইরে আরও কয়েকজন পুড়ে মারা গেছে, অবশ্য তারা যে কারা তা চেনবার মোটেই উপায় নেই। ভিতরে একজন বেশ মোটা

গোছের চীনা নার্স আমাদের একজন ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদছে। যতই তাকে বোঝান হয় যে প্লেনগুলি চলে গেছে ভয়ের কোনও কারণ নেই, সে ততই জোরে চীৎকার করে, 'Oh ! my Lord ! Oh ! my Lord' তার চেয়ে ডাক্তার বেচারার অবস্থা আরও কাহিল ! যতই সে নার্সকে ছাড়িয়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে সেই নার্স আরও জোরে তাকে জড়িয়ে ধরে' চীৎকার করতে থাকে। আপাততঃ বিপদ কেটে গেছে, কাজেই এই করুণ দৃশ্য দেখেও কেউ হাস্য সংবরণ করতে পারে নি।

আমাদের হাসপাতালের তখনকার কম্যাণ্ডার মেজর খাসলি-ওয়াল হেড কোয়ার্টারে টেলিফোনে আমাদের দুরবস্থার কথা জানালেন। উপর থেকে তাঁরা হুকুম দিলেন, তোমরা যেখানে আছ সেইখানেই থাক। রাস্তার দিকের দেওয়াল কতকটা ভেঙ্গে পড়েছিলো। জানালার সার্সী প্রায় সবই টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলি পরিষ্কার করা হল। বাইরে অনেক চেষ্টার পর আগুন নেভানো সম্ভবপর হয়েছে। হাসপাতালের সামনে ছোট একটি মাঠের পাশে একটি গ্যারেজ ছিলো। সেখানা কোথায় যে উড়ে গেছে, তার পাত্তা পর্যন্ত নেই। সামনে কয়েকটি মৃতদেহ পড়েছিলো, সেগুলি টেনে এনে সামনের ট্রেঞ্চে মাটী চাপা দেওয়া হল। অবস্থা একটু শান্ত হলে পর নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে খোঁজ-খবর শুরু হোল। আমাদের বন্ধু শচীন দত্ত। তাকে বহুবার নানা অসম্ভব স্থানে

আবিষ্কার করেছি। এবার অনেকক্ষণ থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হলঘরে একটি বিরাট টেবিলের নীচে চারদিককার চেয়ারের অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করলাম—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো। এমনিভাবে নানা সম্ভব-অসম্ভব স্থান থেকে সকলকে নিরাপদে আবিষ্কার করার পর আমাদের মধ্যে যেন একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো। ইতিমধ্যে দু'একজন বিশেষ অধ্যবসায়ী বন্ধু সেই বাড়ীর একটী ঘরে সিগারেট ও মদের একটী বিরাট ঘাঁটি আবিষ্কার করে। আমাদের আগে এই বাড়ীটি নাবিকদের ক্লাবরূপে ব্যবহৃত হোত। কাজেই বৃটিশ নাবিকদের বাবুয়ানীর সব কিছুই যথেষ্ট পরিমাণে এখানে সঞ্চিত ছিল। সেই লুট করা সিগারেট নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা হল।

কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে আমরা আবার নানা আলোচনায় রত হলাম। আপাতত বিপদ কেটে গেছে, তারপর সাধারণত একবার যেখানে বোমা পড়ে দ্বিতীয়বার সেখানে বড় একটা আক্রমণ হয় না। কাজেই আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত।

ইতিমধ্যে কে একজন খবর রটিয়ে দিলে যে, আমাদের আত্মসমর্পণের কথাবার্তা চলছে। কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে পারলেও আমরা অন্তর থেকে যেন তাই চাইছিলাম। পরাজয় যে নিশ্চিত তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে আর অনর্থক লোকক্ষয়ের আবশ্যক কি? আগেকার নির্দেশমতো সিঙ্গাপুরের

সৈন্যদের উপর আদেশ ছিলো—"Fight to the last man and last bullet." প্রতি মুহূর্তেই শুনছিলাম, শীঘ্রই বৃটিশের সাহায্যকারী বহু সেনা ও প্লেন সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছাবে। এ খবরে বিশ্বাস না করেও উপায় ছিলো না। এতোখানি পরাজয়ের পর হয়তো চাকা আবার উলটে যেতেও পারে, হয়তো প্লেনের সাহায্য পেলে বৃটিশ আবার নূতন বিক্রমে যুদ্ধ করতেও পারে। কিন্তু ক্রমে সব খবরই মিথ্যা প্রমাণিত হল। যুদ্ধ চলতে লাগলো, আমাদের কানে আসতে লাগলো গোলাগুলীর আওয়াজ ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তখনো আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে—আত্মসমর্পণের খবর সত্য কি না। গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে তা মিথ্যে বলেই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যার পর আওয়াজ যেন ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। ভবিষ্যতে যা ঘটবার ঘটবে কিন্তু বর্তমানে কোন প্রকারে যুদ্ধ ত' বন্ধ হোক, দিনের পর দিন শুধু বিভীষিকার মধ্যে বাস করে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি কাজেই শান্তির জন্য প্রাণ উৎসুক হয়ে উঠেছে।

রাত তখন আটটা। হঠাৎ সিঙ্গাপুরের সমস্ত কলরব ভেদ করে বেজে উঠলো "সাইরেন"। বিপদসূচক নয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী 'অল ক্লিয়ার'। সঙ্গে সঙ্গে যেন সিঙ্গাপুর যাদুমন্ত্রের মতো নীরব হয়ে গেলো। মনে পড়লো, কবিগুরুর একটি লাইন "নীরব হইল রণকোলাহল নীরব সমর বাদ্য।"

"আমরা সমরে বন্দী হলাম জাপানী সেনার করে"—

সরকারীভাবে আমরা তখনো পর্যন্ত কোনও খবর পাই নি কাজেই অনেকে অনেক রকম গুজব রটাতে লাগলো। পরে শুনলাম, বৃটিশ পক্ষ থেকে জেনারেল পারসিভ্যাল বিনাসর্তে জাপানী সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আর সেই সঙ্গে সিভিলিয়ানদের পক্ষ থেকে সিঙ্গাপুরের গভর্ণর স্যার টমাস শেণ্টনও আত্মসমর্পণ করেছেন জাপানীদের হাতে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ বিশেষ গ্লানিকর হোলেও সে রাত্রিতে সিঙ্গাপুরের সমস্ত সামরিক ও বে-সামরিক ব্যক্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়—পঁয়ষটি হাজার ভারতীয় সেনা আর প্রায় তিরিশ হাজার ইংরেজ ও অষ্ট্রেলিয়ান সেনা—প্রায় এক লক্ষ বৃটিশ সেনা—আজ এশিয়াবাসী জাপানীর হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। "প্রিন্স-অব ওয়েলস" ও "রিপালসের" শোক ভুলতে না ভুলতে আবার বৃটিশের বুকে আঘাত এলো আত্মসমর্পণের রূপ ধরে। "অজেয় সিঙ্গাপুর" আজ পরের হাতে তুলে দিতে হল। জানি না এই পরাজয়ের কাহিনী বৃটিশ জগতের সামনে কি রূপে দাঁড় করাবে।

বহুদিন পরে কাল রাতে বেশ আরামে ঘুমোনো গেল।

কলরব নীরব হয়েছে। প্রাণের ভয় কমে গিয়েছে। আজ সকালে আবার আমাদের হাসপাতালে রুগী ভর্তি শুরু হয়েছে। আমাদের উপর আদেশ হয়েছে যেখানে যেভাবে কাজ চলছে সেখানে তেমনি ভাবেই কাজ চলবে। সকালে এক কাপ চা' খাওয়ার পরে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটু শহরে বেড়াবার জন্য বাইরে এলাম। বিশেষ ইচ্ছা, জাপানীদের দেখা। যুদ্ধের সময় দু'একজন আহত জাপানী, আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো, তা ছাড়া তাদের সৈন্যদল দেখার সুযোগ আমাদের ঘটে ওঠেনি। যুদ্ধের আগে অবশ্য এদিকে বহু সিভিলিয়ান জাপানীদের দেখেছি। আমাদের আহত সিপাহীদের মুখে জাপানীদের অনেক গল্প শুনেছি। তারা কি পোষাক পরে, কিভাবে যুদ্ধ করে এই সব। ঘর থেকে বেরিয়েই পথে অসংখ্য জাপানীসেনা দেখলাম। ছোট ছোট চেহারা, বেশ শক্ত সমর্থ —চীনাদের সঙ্গে চেহারাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। বেশ-ভূষা অনেকেরই দীনতার পরিচয় দেয়। তখন অবশ্য ভেবে-ছিলাম, এরা একেবারে 'ফ্রন্টের' সৈন্য বলেই এদের পোষাকের এই দুরবস্থা। কিন্তু পরে দেখেছি, এদের আগে ও পিছনের সৈন্যদের একই অবস্থা। অফিসারদের পোযাকে অভিজাত্যের পরিচয়দেয়। প্রায় অধিকাংশের বাঁ পাশেই ঝুলছে কোষবদ্ধ বিরাট তলোয়ার। আর একটি জিনিস যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে যে এদের অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেরই চোখে চশমা। মনে হয় জাপানের অধিকাংশ লোকই হয়তো দৃষ্টিহীনতা রোগে আক্রান্ত।

বড় বড় ম্যাপ নিয়ে তারা খুবই ব্যস্তভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। আমাদের হাতে বড় বড় Red Cross Batch ছিলো কাজেই পথে কেউ আমাদের বাধা দেয়নি। শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। চারিদিকে অনেক বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়েছে। টেলিগ্রাফের থাম ও অনেক গাছ পালা পড়ে অনেক জায়গাতে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় এবং আশে পাশে নালায় চারদিকে অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বড় বড় বোমা পড়ে রাস্তায় বড় বড় অনেক গর্ত হয়েছে। কোথাও গর্তে জল পর্যন্ত উঠেছে। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝার পর পৃথিবী যেন শান্ত মূর্তি ধারণ করেছে, তাই চারিদিকে আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা যেখানে যেখানে ছিলো, সেখানে সেখানেই তারা তাদের সমস্ত হাতিয়ার জমা করছে। গাছতলা ও ছোট ছোট খোলা মাঠে নানা যুদ্ধাস্ত্র স্তূপাকার জমা হয়েছে। ধ্বংসের প্রতিমূর্তি, রাইফেল, মেশিনগান, পিস্তল হাতবোম ও অসংখ্য গোলা বারুদ সবই যেন অবসাদে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অথচ, একটি দিন আগেও এদের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলায় সকলেই ছিল সন্ত্রস্ত। কৌতূহলী নগরবাসীরা বিশেষত বালক বালিকারা, বিশেষ বিস্ময়ের সঙ্গে জাপানীদের চালচলন ও অস্ত্রশস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই বেটে-খাটো জাপানীরা যে কি শক্তিবলে এতো শীঘ্র প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তিকে পরাজিত করে সারা মালয় জয় করলো সে প্রশ্নও আজ সকলের মনের মধ্যে জেগে উঠছিলো। কতোখানি পার্থক্য বিজেতা ও

বিজিতের মধ্যে তা আজ স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত যেসব জায়গাতে ব্রিটিশ পতাকা "ইউনিয়ন জ্যাক" বিরাজ করছিলো ভাগ্য-দেবতার নির্মম পরিহাসে আজ সকালেই সেসব জায়গা অধিকার করেছে সূর্য-মার্কা জাপানী পতাকা "হিনোমারু"। "ফোর্ট ক্যানিং" ও চৌদ্দতলা "ক্যাথে" বাড়ির ছাদে জাপানী পতাকা উড়ছে। ইতিহাসে কতো রাজ্যের কতো সাম্রাজ্যের উত্থান. পতন মুখস্থ করেছি আর আজ চোখের সামনেই সেই ইতিহাসের এক অধ্যায় ঘটতে দেখলাম।

জাপানীদের দেশ কবির দেশ হলেও ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণা জন্মে গিছলো যে, জাপানী জিনিসমাত্রেই খেলো। কাজেই অতি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তারা যে ব্রিটিশকে পরাজিত করতে পারবে এটা ছিলো ধারণাতীত। আজ দেখছি জয়দৃপ্ত জাপানীরা সদর্পে চলেছে রাজপথের উপর দিয়ে—সভয়ে ও সসম্মানে শহরবাসীরা তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ তিন মাস আগেও এখানকার জাপানীদের সম্মান সাধারণ বণিকের মতোই ছিলো। প্রত্যেক জাপানীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে জয়ের উল্লাস, আনন্দের দীপ্তি। আর বৃটিশের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পরাজয়ের গ্লানি। শুনলাম, পনেরো তারিখের রাতে নাকি কয়েকজন উচ্চ পদস্থ বৃটিশ অফিসার আত্মসমর্পণের অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে আত্মহত্যা করেছেন

আবার অনেকে বন্দীজীবন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কাছে ছোট বড় নৌকা যা পেয়েছেন তাই নিয়েই অসীম সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। বেলা প্রায় বারোটা পর্যন্ত আংশিকভাবে শহর পরিদর্শন করে হাসপাতালে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে বেলুচ রেজিমেন্টের সুবেদার লাল খান আমাদের হাসপাতালে এসে আমার খোঁজ করলেন। যুদ্ধের আগে প্রায় একবছর আমি এঁদের সঙ্গে ডাক্তার ছিলাম। সেই সূত্রেই আলাপ ও বন্ধুত্ব। শুনলাম তাঁর ভাই আহত হয়ে বারো নম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয় কিন্তু এগারই তারিখে হাসপাতাল পুড়ে যাওয়ার পর থেকে তার আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। কাজেই লাল খান সিঙ্গাপুরের সমস্ত হাসপাতালে তার খোঁজ করছেন। আমাদের হাসপাতালে সে ছিলো না, কাজেই সব শেষ বাকি রইলো বারো নম্বর হাসপাতাল। তারা কিছু রুগী নিয়ে শহরেই এক জায়গাতে কাজ করছে। লাল খানের একান্ত অনুরোধে তার সঙ্গে সেই সন্ধ্যাতেই বারো নম্বর হাসপাতালে পৌঁছলাম। এখানে তার ভাইকে খোঁজ করে পাওয়া গেলো তবে অবস্থা বিশেষ খারাপ। যাই হোক, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি যথেষ্ট খুসী হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। এই হাসপাতালে আমার কয়েকজন পুরাতন ডাক্তার বন্ধু কাজ করতেন। আজ তাঁদের সঙ্গে দেখা হল। বিশেষত ডাঃ বীরেন রায় ও সনৎ মল্লিক আমাকে দেখে খুবই খুসী হলেন! সেদিন হাসপাতাল পুড়ে যাওয়ার পর

অনেকেরই খবর পাওয়া যায় নি ; আজ সকলেরই খবর পাওয়া গেলো। ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেলো। পথে অনেক জায়গাতে জাপানী "সেন্ট্রী" আমাদের পথরোধ করলেও হাতের "রেড ক্রশ" দেখানোর পর পথ ছেড়ে দিলো। কেউ কেউ জাপানী ভাষায় কিছু প্রশ্নও করেছিলো তার মধ্যে শুধু 'ইগো' কথাটাই বুঝতে পেরেছিলাম। যাই হোক তারা ছেড়ে দিলেও রাতে পথে বেরুনো যে মোটেই নিরাপদ নয়, তা বুঝতে পেরেছিলাম।

তার পরের দিন—

আজও অন্যদিনের মতো হাসপাতালের কাজ চলছে। কয়েকজন জাপানী অফিসার আজ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে গেলেন, অন্যরূপ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেভাবে কাজ চলছে, সেইভাবেই চল্‌বে। শুনলাম যে সমস্ত হাসপাতাল শহরে কাজ করছে সে সব ছাড়া আর সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদের আজ ফেয়ারার পার্কে হাজির হও[illegible] জন্য আদেশ জারী হয়েছে। আমরা খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে [illegible]স করছি। ইতিমধ্যে চারদিকে বেশ গুজব রটে গেছে যে, জা[illegible]রা বড় নৃশংস জাতি। শোনা যাচ্ছে তারা ইতিমধ্যেই চী[illegible]র উপর খুব অত্যাচার করছে। এমনো শুনেছি তারা 'কমিউ[illegible]' সন্দেহে বহু চীনার মাথা কেটেছে। তলোয়ার দিয়ে মাথা কাটার কাজটা তাদের পক্ষে নিতান্ত সহজ যদিও বর্তমান যুগে অন্য কোনও সভ্যদেশে মাথা কাটার প্রথা আছে বলে শুনি নি। আরও

শুনছি তারা নাকি চোর ডাকাতের মাথা কেটে তা' রাস্তার চৌমাথায় টাঙ্গিয়ে রাখছে আর তার তলায় লিখে দিচ্ছে, এই রকম দোষের জন্য এই শাস্তি কাজেই সকলে যেন সাবধান হয়। এই সব খবর শুনে আমরা যে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠছি একথা বলা বাহুল্যমাত্র। আমাদের সঙ্গে জাপানীরা কিরূপ ব্যবহার করবে সেটাই হচ্ছে সন্দেহের বিষয়। আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে আমরা যুদ্ধবন্দীর মতো ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু যে জেনেভার সভায় অন্যান্য জাতিরা এই আইনে স্বাক্ষর করেছিলো জাপানীরা তার মধ্যে ছিল না। তাই সেই সমস্ত আইন মেনে তারা যে আমাদের যুদ্ধবন্দীর সব সুযোগ-সুবিধা দান করবে এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

তারও পরের দিন—

শোনা গেল বৃটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের বন্দী করে জাপানীরা তাদের স্থানীয় 'চাঙ্গি' জেলে কড়া পাহারায় রেখেছে। ভারতীয়দের সম্বন্ধে শোনা গেল, জাপানীরা তাদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হাতে অর্পণ করেছে! বৃটিশের পুরাতন ক্যাম্প-গুলিতে ভারতীয় সৈন্যদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে! আপাতত সেখানে কোনও জাপানী পাহারা রাখা হয় নি। ক্যাম্পের আভ্যন্তরিক সব শাসন-শৃঙ্খলার ভার ক্যাম্পের সর্বোচ্চ পদবীধারী ভারতীয় অফিসারের। মোহন সিংএর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানারকম কথা রটনা হচ্ছে। শোনা যায়, মালয়ের যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই তিনি মালয়ে 'জিত্রার' কাছা-

কাছি জাপানীদের হাতে ধরা পড়েন। তারপর তিনি জাপানীদের সঙ্গে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আসেন। ইতিমধ্যে পথে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে, তিনি তাদের সংগঠিত করে Indian National Army নামে একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং পথে নানাভাবে জাপানীদের সাহায্য করতে করতে সিঙ্গাপুরে এসে পৌছান। জাপানীরা নাকি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপানীরা প্রত্যেক বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। মোহন সিংএর সাথী এ সকল ভারতীয় সৈন্যদের হাতে লাল অক্ষরে 'F' লেখা ব্যাজ ছিল। এই 'F' কথাটির প্রকৃত অর্থ কি জানবার চেষ্টা করেছি। অনেকে বলেছে, F অর্থে Free Army আবার কেউ কেউ বলতো এর প্রকৃত মানেও অর্থ নেই শুধু একটা নিশানা মাত্র। মেজর ফুজিয়ারা তখন, ভারতীয় সৈন্যদের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। কাজেই F অর্থে যদি 'ফুজিয়ারা' বোঝায় তাতেই বা আশ্চর্য কি?

১৯শে ফেব্রুয়ারী—

কাল রাতেই খবর এসেছে, এখানকার হাসপাতালের শতকরা তিরিশজনকে পাঠাতে হবে বন্দী শিবিরে। আজ সকালে নামের লম্বা তালিকা দেখলাম, আমরা সবশুদ্ধ ৩৩ জন। তিনজন আই এম এস্ ও আমরা তিনজন—আমি, শচীন দত্ত রে আর বাকী সব নার্সিং সিপাহী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি। জিনিষপত্র যে যতটা বহন করে নিয়ে যেতে পারে ততটাই নিতে পারবে।

কাজেই কিছু জিনিষপত্র যা' বইতে পারবো বলে মনে করলাম, তাই নিয়েই সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে তৈরী হলাম। কাপড়, জামা, সব পিঠের 'পিঠু'টার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম আর আলাদা, একটা বিছানা বাঁধলাম কাঁধে নেবার জন্য। এতদিন তবু নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমরা অনেকে একসঙ্গে ছিলাম, এবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে আবার কখনও দেখা হবে কিনা, ভাগ্য-বিধাতাই জানেন। তারপর বন্দী-জীবন—এও তো জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা। যাই হোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরিচিত সকল বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। সকলেই বললে, 'তোমাদের শুভেচ্ছা কামনা করি' অবশ্য শুভ যে কতটা হবে কে জানে? ভাগ্য খারাপ না হলে আর বন্দী হ'তে যাব কেন?

আমরা দল বেঁধে মার্চ করে পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম, ফেয়ারার পার্কের দিকে। আপাতত সেখানে যাওয়ার নির্দেশ ছিল আমাদের উপর। রাস্তার দুপাশে পথচারীরা আমাদের দিকে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। কিছু-দিন আগেও যারা এই রাস্তার উপর দিয়ে গর্বোন্নত মস্তকে ঘুরে বেড়িয়েছে আজ বিধাতার নির্মম পরিহাসে তারাই চলেছে নতমস্তকে বন্দীবেশে। কোথায় তাদের সেই রাইফেল কোথায় বা তাদের সেই সৈনিকোচিত সগর্ব পদক্ষেপ? শ্রান্ত, ক্লান্ত, পরাজিত তাই হঠাৎ একদিনের মধ্যেই এসেছে এক অভাব-নীয় পরিবর্তন।

দুপুরে আমরা পার্কে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু শুনলাম এখানে আমাদের কোনও বন্দোবস্ত নেই—যেতে হবে বিদ্যাধরী ক্যাম্পে। আবার সেখান থেকে বিদ্যাধরীতে মার্চ করে উপস্থিত হলাম। এখানে কোনও কিছুরই বন্দোবস্ত নেই। কতকগুলি খালি ব্যারাক ছিলো আমরা তারই দু তিনটি অধিকার করলাম। ইতিমধ্যেই এখানে আরও কয়েকটি 'ইউনিট' উপস্থিত হয়েছে। এখানে পৌঁছানর পরই প্রধান সমস্যা হল খাওয়ার। সঙ্গে কিছু আনি নি, অথচ হুকুম নাকি ছিলো তিনদিনের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করে নিয়ে আসার। কোথাও তখনও পর্যন্ত সুবন্দোবস্ত হয় নি কাজেই চারিদিকে ঘোরাঘুরি করেও বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। অবশেষে সন্ধ্যার পরে অন্য ইউনিটের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে কিছু চাল ডাল বাসন ধার করে আনা হল। সকালে অল্প খাওয়া হয়েছিল। তারপর অনেকটা পথ হেঁটে এসে সকলেরই বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। সেই চাল ডাল মিশিয়ে নাম মাত্র খিচুরী তৈরী করে রাতের মতো উদর পূর্ণ করা গেল। এবার আবার চিন্তা হল কালকের বন্দোবস্ত কি হবে। অসুবিধা দেখে অন্য তিনজন অফিসার তাদের বন্ধু বান্ধবের খোঁজ করে সেখানেই সরে পড়লেন কাজেই সব ভার পড়লো আমাদের তিনজনের উপর।

আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু বেশ চালাক লোক। পরের দিন 'F' মার্কা দু'টি লোককে হাত করে শহরের এক রেশন 'ডাম্প'

থেকে কয়েক বস্তা আটা, কয়েক বাক্স দুধের টিন ও কিছু মাছের টিন হস্তগত করলেন। কাজেই গোড়ার দিকে সকলের খাওয়ার খুব অসুবিধা হলেও আমাদের খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়নি। সাধারণ রেশন খুবই কম ছিল—মাত্র এক পাউণ্ড চাল। তার উপরে সেই চা'লে ছিল যথেষ্ট চুণ। সিঙ্গাপুর শহরে বৃটিশ অনেক কিছু জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছিল। কারণ বৃটিশের ধারণা ছিল হয়তো অবরোধ অবস্থায় অনেকদিন সিঙ্গাপুরে থাকতে হবে। শুনেছি প্রায় দশ লক্ষ লোকের এক বছরের মতো খাদ্যদ্রব্য ও জামা কাপড় সিঙ্গাপুরে জমা ছিল। আমরা 'এলকক বাগানের' নীচের দিকে ছিলাম। তখন চারদিকে কাঁটা তার প্রভৃতি কিছুই ছিলনা, কাজেই জায়গাটা বন্দীশালা বলে মোটেই মনে হত না। পাশেই রাস্তা তাই অবসর সময়ে জনপ্রবাহ দেখেও শান্তি পেতাম। বাগানের অন্যদিকে বড় ক্যাম্পে আমাদের বহু 'ইউনিট' ছিল। একদিন সেখানে দেখা করতে যাই। আমার পুরাতন 'ইউনিট' 'বোম্বে স্যাপার ও মাইনর' তখন সেখানে এসে পৌছেছে। প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম তাদের সাড়ে তিনশো লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচজন মারা গেছে। যদিও তারা একেবারে 'কোটা বারু' থেকে যুদ্ধ করতে করতে সিঙ্গাপুরে এসে পৌছেছে। প্রথমে অনেকেরই ধারণা ছিল যে, বহু ভারতীয় মারা গেছে, কিন্তু পরে দেখা যায়, মরেছে খুব কমই। আর বেশীর ভাগ এদিকে ওদিকে আত্মগোপন করছিলো—যুদ্ধ বন্ধ

হবার পর আবার তারা নিজেদের দলে এসে যোগদান করেছে। অনেকে আবার যুদ্ধের সময় পালিয়ে স্থানীয় সিভিলিয়ানদের সঙ্গে মিশে এখনও বাইরেই রয়েছে।

এই ক্যাম্পে জলেরও খুব কষ্ট ছিল। প্রত্যহ স্নান করা আমরা বিলাসিতা বলেই মনে করতাম। উপরের ক্যাম্পে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে, তবে ঔষধপত্রের বিশেষ সুবিধা নেই। আমাদের অফিসাররা অনেক চেষ্টা করেও এখনও সুবন্দোবস্ত কিছুই করে উঠতে পারেন নি। রোজই ক্যাম্প থেকে জাপানীরা আমাদের বহু লোককে 'ফেটিগের' জন্য নিয়ে যেত। সকাল বেলা ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের আদেশ মত প্রত্যেক ইউনিট থেকে যত লোকের 'ফেটিগ' যাবার কথা তারা এক জায়গাতে সমবেত হত আর জাপানীরা সেখান থেকে লরী করে তাদের নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে জাপানীরা এত বেশী লোক চেয়ে পাঠাতো যে, পিছনে রান্নার কাজের লোক পর্যন্ত কম পড়ে যেত। ডাক্তারদের মধ্যেও অনেককে বহুবার এই সমস্ত 'ফেটিগের' কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। তাছাড়া নার্সিং সিপাহী ও অন্যান্যদের তো যেতেই হত। কাজও খুব কঠিন ছিল। রাস্তা পরিষ্কার করা, নালার মৃতদেহ তোলা, তাছাড়া এরোড্রোম তৈরী করা। প্রায় বারো ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের সিপাহীরা একবারে ক্লান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসত। তারপর খেতে পেত ছুটি চুণ-মেশানো চাল। বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীরা তবু ভাত খেয়ে কোনও রকমে দিন

কাটাতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হোত পাঞ্জাবী-দের। রুটী ছাড়া তাহারা অন্য কিছু পছন্দ করে না, কাজেই অনেকে সেই চাল গুড়ো করে তারই রুটী তৈরী করে খেত। তারপর রেশন বরাদ্দ হচ্ছে মোটে এক পাউণ্ড। সব সময় আবার পুরো এক পাউণ্ডও পাওয়া যেত না। এইটুকু চাল একজন লোকের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া সকলকে অত্যধিক পরিশ্রমের কাজ করতে হত।

এই দুঃখের মধ্যেও দিন একেবারে মন্দ কাটছিল না। আমরা তিনজন এক সঙ্গে ছিলাম, কাজেই সুখ দুঃখের গল্প করেও সময় কেটে যেত। উপরের ক্যাম্প থেকে ডাঃ শিশির চাটার্জি ও ডাঃ মন্মথ চৌধুরী মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে গল্প গুজবে অনেকখানি সময় কাটিয়ে যেত। সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার পরই একখানা ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তাতে যুদ্ধের খবর থাকত। জাপানীরা সিঙ্গাপুরের নাম বদল করে নূতন নাম দিয়েছে "সাইনন-টো"। মাঝে মাঝে জাভা চট্টগ্রামেও বোমা পড়েছে। আমরা কাগজের খবর নিয়ে প্রায় নানারূপে আলোচনা করতাম। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময়, কতদিন এমনিভাবে বন্দী থাকতে হবে কে জানে? তারপর বাড়ির চিন্তা। আমাদের এখানে 'রেড ক্রসের' কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না যার দ্বারা বাড়িতে চিঠিপত্রাদি লিখতে পারা যায়। কাজেই এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন গুণতে লাগলাম। এখানে আসার কয়েকদিন পরেই ১৫নং ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের

একজন আই, এম, ডি, ট্যাপসেল আত্মহত্যা করে। হয়তো ভবিষ্যতের ভাবনাতে কাতর হয়েই সে এ জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করেছে। তার এ মৃত্যু কাহিনী করুণ হলেও তার সেদিনকার অবস্থা আমরাও কতকটা অনুভব করতে পেরেছি। মনের অবস্থা আমাদেও প্রত্যেকেরই খুব খারাপ অথচ প্রাণের মধ্যে ক্ষীণ আশা হয়তো জীবনে আবার কখনও সুদিন আসতে পারে।

আমরা ক্যাম্পের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতাম। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তার উপর অত্যধিক পরিশ্রমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তারপর শুরু হোল আমাশয়। প্রত্যহ প্রায় চার-পাঁচশো লোক আমাদের হাসপাতালে ঔষধের জন্য ধরণা দিতো। ঔষধ বলতে গেলে আমাদের কাছে কিছুই নেই, তবু তারা শুনতে চায় না। কাজেই আমরা সামান্য যা তা দিয়ে তাদের প্রবোধ দিলাম। আর যাতে রোগ বেশী ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রত্যেককে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে ক্যাম্পের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিজেদের বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। এইভাবে আমাশয়ের প্রকোপ একটু কমেছিল

আমাদের ক্যাম্পের চারিদিক খোলা। মাঝে মাঝে জাপানী সিপাহীরা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ত আর সামনের যে জিনিষটা পছন্দ হত সেটাই চেয়ে বসত। অবশ্য চাওয়াটা

নিছক ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ না দিলেও সে জোর করেই নিয়ে যাবে। এমনিভাবে তারা অনেক ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, আংটি এমন কি প্যান্ট কামিজ পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গেছে। যারা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে বা একটু বাধা দিয়েছে তারা দুচারটা চড় চাপড় হজম করে তবে জিনিষ দিতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই সাবধানের মার নাই, এই নীতি অবলম্বন করে আমরা আমাদের ঘড়ি, পেন প্রভৃতি লুকিয়ে রাখতাম। আর সেইজন্যই তাদের হাত থেকে এগুলি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। ব্যারাকের সামনেই একটি তিনতলা বাড়ি ছিল, অনেক সময় জাপানী সিপাহীদের সেই বাড়িতে ঢুকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। কাজেই তারা যে শুধু বন্দীদের কাছে এসে জোর জুলুম করতো তা নয়, অনেক সময় সিভিলিয়ান অধিবাসীরাও তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হত। পয়সা টাকা আমাদের কাছে বিশেষ কিছু ছিল না। অল্পস্বল্প যা ছিল তাই দিয়ে মাঝে মাঝে তরিতরকারী কিনতাম। জাপানীরা বৃটিশের নোটের সমমূল্য নোট দিত। রাস্তার পাশ দিয়ে যে সব লোক তরিতরকারী বিক্রি করতে যেত মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকেই কাচকলা শাক প্রভৃতি কিনতাম। অবশ্য অন্য কিছু কেনা আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল।

মাঝে মাঝে শুনতাম জাপানীরা ভারতীয় বন্দীদের 'ফেটিগের' কাজের জন্য মালয় ও মালয়ের বাইরে নানা জায়-গাতে পাঠাচ্ছে। আমাদের পাশের ব্যারাকের ১৫নং ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্সের উপর হুকুম এসেছে তারা যেন 'জাভা' যাবার জন্য

সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আত্মসমর্পণের কয়েকদিন পরেই একটি দলকে নাকি ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয় তার মধ্যে ডাক্তার হিসাবে গেছেন আমাদের চন্দ্রদা, অর্থাৎ অমূল্যকুমার চন্দ্র। কাজেই আমরাও সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতাম হয়তো যে কোন সময়ে আমাদের উপরও হুকুম আসবে কোথাও যাওয়ার জন্য। অবশ্য আমরা যখন ঘর-ছাড়া তখন আমাদের পক্ষে জাপান সিঙ্গাপুর বা জাভা সবই সমান। তবু পরিচিত স্থানের উপর একটু মায়া হয় তারপর বাইরে যাওয়ার পথটাও নিতান্ত নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে সমুদ্রে সাবমেরিণের অত্যাচারে যে জাহাজ ডুবি হচ্ছে এমন খবরও শোনা যাচ্ছে। আত্ম-সমর্পণের পর সিপাহীদের অনেকের ধারণা হয়েছে, এখন অফিসার ও সিপাহীরা সকলেই সমান—কাজেই আমাদের যে সব আরদালী আগে কাজ করতো এখন তারাও কাজ করতে অনিচ্ছুক, কাজেই কাপড় জামা কাচার কাজটা সন্ধ্যার পর অন্ধকারেই সেরে নিতাম। আমাদের মধ্যে অনেকে প্রায়ই শহরে বেড়াতে যেত। অবশ্য লুকিয়ে। তবে রাস্তায় জাপানীরা কোনরূপ বাধা দিত না। আমরা ইচ্ছা করেই বাইরে যেতাম না কারণ একেতো হাতে পয়সা কড়ি নেই, তার উপর পরাজিত ভারতীয়দের সব জাতিই ঘৃণা করে। চীনারা তো আগে থেকেই ভারতবাসীদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। মালয়বাসীরা নিরীহ জাতি, ভয়ে কতকটা ভক্তি করতো। কাজেই বাইরে যাওয়া মানে অনর্থক কতকটা অপমান সহ্য করা

এমনিভাবেই আমাদের দিন কাটছিল। প্রথমে অবস্থা পরিবর্তনে যতটা ভয় পেয়েছিলাম, এখন আবার ক্রমশঃ কতকটা অভ্যস্থ হয়ে উঠলাম। দুঃখের মধ্যেই যখন জীবন যাপন করতে হবে—তখন সেই দুঃখকেই নিবিড়ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় কি? কাজেই প্রত্যেক সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। এর মধ্যেই যতটা আনন্দে দিন কাটাতে পারা যায়, আমরাও ততটাই চেষ্টা করতাম। সেই জন্যই উপরের ক্যাম্পের চাটার্জি এলে আমরা মাঝে মাঝে একটু তাসের আড্ডা জমিয়ে তুলতাম। তারপর নানা সুখ দুঃখের গল্প হত। বিপদের মধ্যে দুঃখের মধ্যে যাদের সাথী পাওয়া যায়, তাদেরই জীবনে প্রকৃত বন্ধুরূপে গ্রহণ করা চলে। শচীন দত্তের সঙ্গে এক সঙ্গে বহুবার বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি; কাজেই আজও দুজনে সব দুঃখ ভাগ করে বহন করতে লাগলাম। মাদ্রাজী বন্ধুরা বাইরের সমস্ত কাজ করতেন আর আমাদের এই নব্বইজন লোকের কম্যাণ্ডার হিসাবে কাজ করতেন। সাংসারিক জ্ঞান তার যথেষ্ট ছিল। আর সেই সঙ্গে মিষ্টি কথায় কাজ হাঁসিল করার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রথম দিকেই তিনি কিছু রেশন যোগাড় করতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের অন্যদের মতো খুব বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়নি।

এমনিভাবেই বিদ্যাধরী ক্যাম্পে আমাদের প্রায় একটি মাস কেটে গেল, আত্মসমর্পণের পর। তারপর একদিন হঠাৎ হুকুম হল, আমাদের যেতে হবে 'সলিতা'র ক্যাম্পে ঃ আবার তৈরী

হলাম। এবার সঙ্গে কিছু রেশন ও রান্নার বাসন ছিল তাই লরীর জন্য চেষ্টা করতে হল। লরী পাওয়া গেল, কিন্তু দু'শো-জন পিছু একটি লরী হিসাবে। কাজেই আমাদের ভাগে জুটলো মাত্র আধখানা লরী। ডাঃ রে অনেক চেষ্টা করে একটি পুরো লরী যোগাড় করলেন। আমাদের সমস্ত রেশন দিয়েও কিছু জায়গা রয়ে গেল, তাতে আমাদের প্রত্যেকের বিছানা তুলে দিলাম। আর শুধু মাত্র 'পিঠু' নিয়ে আমরা মার্চ করলাম 'সলিতা' অভিমুখে। দুপুরের দিকে সলিতা ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলাম। এটি আগে একটি রবার জঙ্গল ছিল। বৃটিশ সেই জঙ্গলের মধ্যেই একটি ক্যাম্প তৈরী করেছিল। এখানে বাসের জন্য একটি লম্বা ব্যারাক পেলাম। তারই একদিকে একটি পার্টিশান দিয়ে তিনজনের জন্য আলাদা জায়গা করে নিলাম।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই ক্যাম্প, আর চারিদিকেই কাঁটা তারের বেড়া। কাজেই এখানে আসার পরই মনে হল আমরা প্রকৃতরূপে বন্দী। এই ক্যাম্পে তখন সবশুদ্ধ প্রায় বারো হাজার ভারতীয় বন্দী ছিল। এখানে পৌঁছানর পর বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল। তখন ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার ছিলেন হাঁয়দরাবাদ রেজিমেণ্টের লেঃ কর্ণেল ইসাক। যুদ্ধের আগে আমি এই রেজিমেণ্টের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেছিলাম—সেই সূত্রে এদের অফিসার লেঃ ইসাকের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। যুদ্ধের সময় এদের বহু সিনিয়র অফিসার মারা যাওয়াতে লেঃ ইসাক পরের লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন।

এই ক্যাম্পে আর একটি সুবিধা ছিল—রাত বারোটা পর্যন্ত বিজলীর আলো পাওয়া যেত। এখানে বিদ্যাধরীর চাইতে বন্দোবস্ত অনেক ভাল ছিল। এই ক্যাম্পের পাশেই একটি ক্যাম্পে একটি হাসপাতাল। এটি ৪নং হাসপাতাল নামে পরিচিত। এর কম্যাণ্ডার লেঃ কর্ণেল বিজেতা চৌধুরী। আমাদের ক্যাম্পের ভিতরেও একটি ছোট হাসপাতাল ছিল। ক্যাম্পের সব ডাক্তারই সকালে হাসপাতালে কাজ করতেন, তাছাড়া ডিউটি হিসাবে মাঝে মাঝে একজনকে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটী দিতে হ'ত এখানকার হাসপাতালে। নার্সিং সিপাহী প্রভৃতিকে বাহিরের 'ফেটিগে' পাঠানো হ'ত না। তারা ক্যাম্পের ভিতরে কাজ করতো এবং দরকার মত এখান থেকে ষ্ট্রেচারে করে রুগী নিয়ে যেত ৪নং হাসপাতালে। খুব বড় ক্যাম্প হওয়াতে এখানে রুগীর সংখ্যাও খুব বেশী ছিল। প্রত্যহ পাঁচ-ছ'শো আসত শুধু আমাশয়ের রুগী। তা ছাড়া ক্রমে ক্রমে শুরু হল ভিটামিনের অভাবে নানা রোগ, দৃষ্টিহীনতা, চুলকানি, দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া প্রভৃতি। আমাদের খাদ্য ছিল শুধু চাল, তার পরে নূন যা বরাদ্দ ছিল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। কাঁটাতারের বাইরে চীনারা কিছু কিছু শাকসব্জী বিক্রি করতে নিয়ে আসত, আমরা মাঝে মাঝে সেখান থেকে মোচা ও কাঁচকলা কিনে আনতাম, কারণ এই দুটিই ছিল সবচেয়ে সস্তা। সন্ধ্যার পর আমি ও দত্ত দুজনে মিলে সেই মোচা কেটে পরিষ্কার করে জলে ভিজিয়ে রাখতাম—আর সকালে আমরা নিজেরাই তাই রান্না

করতাম। আমাদের দেখা-দেখি অন্যান্যরাও মোচা কিনতো,—কিন্তু বিশেষ প্রণালীতে না কাটার জন্য তার স্বাদ হত তিক্ত।

এখানে অফিসারদের জন্য রেশনের সঙ্গে এক প্যাকেট করে উডবাইন সিগারেট বরাদ্দ ছিল, কিন্তু এক প্যাকেটে কারও পক্ষে এক সপ্তাহ চলা সম্ভবপর নয়, তাই আমরা তা চীনাদের কাছে দশ আনাতে বিক্রি করে, সেই পয়সায় জাভার তামাক ও সিগারেটের কাগজ কিনতাম। এতে আমাদের সপ্তাহের সিগারেট পুরো হয়েও কিছু পয়সা বাঁচতো, তা দিয়ে শাক বা মোচা কিনে তরকারী রাঁধতাম। ক্রমে রেশন কমে গিয়ে কিছুদিনের জন্য মাত্র বার আউন্স চাউল বরাদ্দ হল। তখন অনেকেই কম খাওয়ার দরুণ ভয়ানক দুর্বলতা বোধ করত, অনেকেই আবার হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। এই ক'টি চা'লে জীবনধারণ করা যে মোটেই সম্ভবপর নয়, সে কথা জাপানীদের বহুবার বুঝিয়ে বলার পরও রেশনের কোনও উন্নতি হয় নি। সেজন্য নিজ নিজ ব্যবস্থানুযায়ী সপ্তাহে একদিন করে উপবাসের বন্দোবস্ত করলাম। আমরা অর্থাৎ ডাক্তাররা কোনও শ্রমসাধ্য কাজ করতাম না, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট দুর্বলতা বোধ করতাম। যে সমস্ত সিপাহী দশ বারঘণ্টা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করত, তাদের পক্ষে এই সামান্য ক'টি চা'ল জলযোগের উপযুক্তও নয়। কিন্তু উপায় নেই। যাদের হাতে বন্দী হয়েছি এখন তাদের উপরই আমাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করছে, কাজেই নিষ্ফল আক্রোশে খানিকটা গালি দিয়ে মনের ঝাল মেটানো

ছাড়া উপায় ছিল না। অনেকে বলত, এমনিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মেরে ফেলাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের সময় শুনেছিলাম যে জাপানীরা বন্দী রাখে না মেরে ফেলে, কিন্তু মেরে ফেলার কোন খবর না শুনলেও এতোগুলি বন্দী এক সঙ্গে পাওয়াতে তাদের যে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিলো একথা সত্য। বৃটিশের মতো তারা আগে থেকে সব কিছু বন্দোবস্ত করে রাখে নি। বহু জাপানীকে যুদ্ধে বন্দী করা যাবে এই আশাতে বৃটিশ আগে থেকেই তার বন্দোবস্ত করেছিলো। কিন্তু যারা জাপানী বন্দীদের জন্য 'ওয়ার কেজ ইউনিট' নিয়ে গিছলো দুর্ভাগ্যক্রমে তারাই জাপানীর হাতে বন্দী হোল। কাজেই সিঙ্গাপুরে যথেষ্ট রসদ থাকা সত্ত্বেও জাপানীদের বন্দোবস্তের দোষে আমাদের বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তার উপর এরা আমাদের হাতখরচ হিসাবেও কিছু দিত না। হাত খরচার জন্য কিছু পেলেও, কিছু কিনে খাওয়ার উপায় থাকত।

আত্মসমর্পণের পর সকলেরই দেখলাম ভগবানের উপর ভক্তি খুব বেড়ে উঠল। প্রত্যেক ব্যারাকের পাশেই তৈরী হতে লাগল মন্দির মসজিদ ও গুরুদ্বার। মুসলমানেরা বড় বড় কোরাণ সরিফ নিয়ে নিয়মিত ভাবে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তো। হিন্দুদের অবশ্য দেবতা বহুরূপী। কাজেই নানা দেবতার নানা মন্দির গড়ে উঠল এবং সৈন্যদের মধ্যে-থেকেই পূজারী ব্রাহ্মণ যথেষ্ট পাওয়া গেল। রাত বারটা অবধি, পূজা পাঠ কীর্তন সব কিছুই চলত। মাঝে মাঝে 'জয় বজরং বল্লী জী

কী জয়' রব শুনে আমাদের প্রথম রাতের ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমাদের একজন মারাঠী ডাক্তার শিরীষকুমার যোশী, অনেকেরই গুরুদেবে পরিণত হলেন। গায়ে চাদর জড়িয়ে তিনি রোজই নানা মন্দিরে পূজো করতেন। শিখেরা তাদের গুরুদ্বারে দলে দলে যোগদান করত। তবে সুবিধা ছিল এই যে, গুরুদ্বার সকলের জন্যই খোলা কাজেই 'কড়া প্রসাদের' লোভে আমরাও মাঝে মাঝে উপস্থিত হতাম। বলা বাহুল্য পূজারীদের ফেটিগের কাজে যেতে হত না, আর ঠাকুরের নামে অথবা কৃপাতে আমাদের মত আধপেটা খেয়েও থাকতে হত না। বিপদের দিনে দুঃখের সময়েই মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে তাই বোধ হয় দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য আজ এতখানি আয়োজন। অবশ্য এর মধ্যে কতটা আন্তরিকতা ছিল আর কতটাই বা বাহ্যিক ভড়ং তার হদিস মেলা কঠিন। তবে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রসাদ পেয়ে আমরা ধন্য হতাম একথা সত্য।

ক্যাম্পের কাঁটাতারের ভিতরে বড় একটা মাঠ ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমরা অনেক বাঙালী সেখানে এসে জড় হতাম। নানা সুখদুঃখের গল্প হত। দু'একজন গায়ক মাঝে মাঝে গান শুনিয়ে সকলকে আনন্দ দিতেন। এই রকমে আস্তে আস্তে সারা ক্যাম্পের বাঙালীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। তখন একদিন কথা উঠল, আমরা সব বাঙালী একদিন এক সম্মিলনী করব। তারপর একদিন সত্যই লেঃ কর্ণেল বিজেতা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আমরা সলিতা ক্যাম্পে একসঙ্গে মিলিত হই।

কয়েকটি বাঙলা গান আলাপ আলোচনা ও চা পানান্তে সভাভঙ্গ হল। সেদিন হিসাব করে দেখেছি সলিতা ক্যাম্প ও চার নং হাসপাতাল মিলে আমরা সব শুদ্ধ একশো পঁচিশজন মিলেছিলাম সেখানে।

একদিন সন্ধ্যায় মাঠে বসে গল্প করতে গিয়ে সেখানে আরও কয়েকজন নবাগত বাঙালীকে দেখলাম। একজন পরিচয় করিয়ে জানিয়ে দিলে যে এরা সম্প্রতি জাভা থেকে এখানে এসেছেন। একজনের নাম সলিল কুমার ঘোষ, আমারই আত্মীয়। তার কাছে আমরা জাভার অনেক গল্প শুনলাম। ছেলেবেলাকার নানা রকম গল্পের বইয়ে জাভা, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ প্রভৃতির যে সব কাহিনী পড়েছি তাতে এই বয়সেও অনেক সময়ে মনে হত এ সব দেশ কতকটা স্বপনপুরীর মত। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে সব কিছু শুনে কতকটা ধারণা হল জাভার সম্বন্ধে। তারপর শুনলাম জাভাতে যুদ্ধ মোটেই হয় নি। কতকটা বিনাযুদ্ধেই জাপানীরা দ্বীপ অধিকার করেছে। আরও শুনলাম ওলন্দাজ সৈনিকেরা একেবারেই 'বাবু'। তারা নিজেরা যুদ্ধের রসদ ব'য়ে নিয়ে যাবে না, তার জন্য দরকার তাদের কুলীর। কাজেই এমন সৈনিকরা যে কতটা যুদ্ধ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই জাপানী যদি একেবারেই বিনাযুদ্ধে জাভা অধিকার করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কোনও কারণ নেই।

আত্মসমর্পণের পর সেখানকার ভারতীয় ও বৃটিশ বন্দীদের

সিঙ্গাপুরে আনা হয়। বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান বন্দীদের স্থানীয় চাঙ্গী জেলে রাখা হয়। এখানে কাপ্তেন মোহনসিং এর অধীনে একদল ভারতীয় সেনা প্রহরীর কাজ করতো। ফেটিগের কাজ জাপানীরা সকলের কাছ থেকে সমানভাবে নিতো, তবে বৃটিশদের জেলের ভিতরেও অমোদ প্রমোদের সুবন্দোবস্ত ছিলো এবং তাদের রাসনও আমাদের চাইতে উ[illegible]তধরণের! হাজার হ'লেও তারা স্বাধীন দেশের লোক আমা[illegible]র মতো পরাধীন দেশের নয়। আমরা এখানে আসার পর নানারকম আলোচনা শুনতে পাই, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে। এখানেও একদিন একটি বিরাট সভা হয়। যারা সভা আহ্বান করেছিলেন, তাঁদের অনেক প্রশ্ন করা হয়, যেমন, জাপানীরা যে আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য করবে সেটা মৌখিক ছাড়া অন্য কিছু নাও তো হতে পারে। তারা যে আমাদের দেশ অধিকার করার পরও সেখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে না তারই বা বিশ্বাস কি? এমনি অনেক প্রশ্ন হয়। সভাভঙ্গের পর সকলেই আলোচনা করতে শুরু করে বতমান অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। কারণ সকলেই বৃটিশ পক্ষের লোক হওয়া সত্ত্বেও, স্বাধীনতার জন্য অনেকেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে—কার নেতৃত্বে। মোহন সিংয়ের দেশপ্রেমের প্রশংসা করা চলে, কিন্তু তিনি সৈনিক, রাজনীতি[illegible] নন। সে ক্ষেত্রে জাপানের পক্ষে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন নাও হতে পারে। তা ছাড়া রাসবিহারী বসু—তার উপর অনেকের

আস্থা থাকলেও আবার অনেকে তাঁকে দীর্ঘকাল জাপানে বসবাস করার দরুণ, কতকটা জাপানীভাবাপন্ন বলে আখ্যা দিয়েছেন। তখন সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের খবর সকলেই জানতো এবং তিনি যে জার্মানীতে রয়েছেন একথাও বিশ্বাস করত। কাজেই প্রশ্ন উঠল—তাঁকে পূর্ব এশিয়ায় আনা সম্ভবপর কিনা। তিনি যদি মালয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা'হলে অনেকেই এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করতে প্রস্তুত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সুদূর জার্মান রাজধানী থেকে মালয়ে আসা নিতান্ত সহজ নয়। কাজেই বর্তমানে তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের ক্যাম্পে লাউড স্পীকার রেডিও ছিল কাজেই খবর ও গান বাজনা শোনা যেতো। এখানকার রেডিও দেখতো সুধাংশু চক্রবর্তী। সে একদিন খবর দেয় বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করবেন। সাধারণতঃ আমরা রেডিওতে কোনও খবর বা গান শুনতে যেতাম না, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার আগে থেকেই সকলে দলে দলে রেডিওর পাশে হাজির হই। বহুদিন পরে তাঁর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে ভেসে এলো। মাঝে মাঝে সিপাহীরা "জয় সুভাষবাবু কী জয়" রবে বক্তৃতা শোনায় বাধার সৃষ্টি করছিলো। প্রথম দিনে ইংরেজী, তারপর দিন হিন্দুস্থানী ও শেষের দিনে বাঙলায় তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে তিনি জীবিত আছেন, এবং তিনি বার্লিনে আছেন। কারণ এর আগে তিনি যে

কোথায় আছেন বা সত্য সত্যই জীবিত আছেন কি না সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ ছিলো।

এখানে আমরা প্রায় দশ বারোজন ডাক্তার ছিলাম। আমরা ছাড়াও এখানে অনেক 'ইউনিট' ছিলো। একটি দল ছিলো পোষ্ট আফিসের। এঁদের রান্না খাওয়া ও তাস খেলা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিলো না। এরা সকলেই সিভিলিয়ান মিলিটারীতে বদলী হয়েছেন। আর পদমর্যাদায় প্রায় সকলেই অফিসার। এরা দুটো ব্যারাক দখল করে থাকতেন আর সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তাস খেলতেন। অত্যধিক খেলার দরুণ তাসের অক্ষরগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়ে উঠেছিলো অথচ কারো হাতে পয়সা নেই যে নূতন তাস কেনা হবে। তাই সেই তাসেই খেলা চলতো। এই দলে অনেক বাঙালী ছিলেন। এদের দলে সিপাহী প্রভৃতি না থাকাতে অবশ্য রান্না, কাঠ কাটা এ সব সকলে পালা করে নিজের হাতে করতেন।

সকালে হাসপাতালের কাজ করতাম। কাজ অবশ্য বেশী কিছু নয়। তার ভণিতাটাই বেশী। ঔষধ মোটে নেই, অথচ রোগীর সংখ্যা হাজার হাজার। তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য বড় বড় বোতল জলে ভর্তি করে রাখতাম। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিলো না। পায়ে সকলেরই ফোঁড়া ও চুলকানি হতে লাগলো অথচ ঔষধ নেই। তখন ডাঃ রুদ্র এক রকম পাতার নাম বাতলে দিলেন, তার নাম হচ্ছে 'চুত্রল'। তখন সুরু হল প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে চুত্রল পাতা এনে তার রস তৈরী করা। কিন্তু তাও

নিতান্ত সহজ কাজ নয়। প্রায় এক হাজার রোগীকে ছোট চামচের এক চামচ রস দিলেও এক হাজার চামচ রসের দরকার। তবু রোগীরা আশ্বস্ত হত, ঔষধ পেয়েছে বলে। তারপর হতে লাগল স্কার্ভি প্রায় প্রত্যেকেরই। দাঁতের গোড়া ফুলে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ছে। ভিটামিনের অভাবে নানা রকম অসুখ হয় তা জানা ছিলো কিন্তু এমন ভীষণভাবে তার প্রকাশ আগে দেখি নি। বহু কষ্টে এ সব রোগীদের জন্য জোগাড় করা হোল কিছু পাতিলেবু ও অঙ্কুরিত মুগ। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, তবু এক চামচ মুগ ও আধখানা লেবু প্রত্যেক রোগীকে দেওয়ার বন্দোবস্ত হল কয়েক দিনের জন্য। সেই গুটিকয় মুগ ও লেবুটুকুর জন্য অফিসাররা পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন। তারপর আমাশয়ে ভোগার পর প্রায় সকলেরই শুরু হোল রক্তহীনতা। তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নেই, ঔষধ নেই, কাজেই একমাত্র মৃত্যু বরণ করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রইলো না। প্রতিদিন হাসপাতালে কয়েকজন করে রুগী নিয়মিতভাবে মারা যেতে লাগলো।

সকালে হাসপাতালের কাজ করার পর দুপুরের কতকটা সময় ঘুমিয়ে আর কতকটা তাস খেলে ও বই পড়ে কাটাতাম। এখানে আগে রয়াল এয়ার ফোর্সের লোক থাকতো। তাদের জন্য একটি লাইব্রেরী ছিলো। এই লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো বই ছিল। Robert Bruce Lockhurtএর লেখা একটি বই "Return to Malaya" বইখানা এখানেই প্রথম

পড়ি। পূর্ব এসিয়ার আজ যা' পরিণতি হয়েছে এই পুস্তকে তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এই লেখক "গত যুদ্ধের পর থেকে এদিকে শ্বেত জাতির অধিকার ও প্রতিপত্তি অনেকটা কমে গেছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের এদিক ছাড়তে হবে। উদীয়মান সূর্য সত্যই উদয় হচ্ছে জাপানের মধ্য দিয়ে।" সারা এশিয়ায় জাপান যে কতদিন আগে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে কথাও এই বইটির ছত্রে ছত্রে লেখা, যদিও বইখানা ছাপা হয়েছে ১৯৩৬ সালে। সব জানা সত্ত্বেও বৃটিশ একমাত্র সিঙ্গাপুরের নৌবহরের গর্ব নিয়ে চুপচাপ কি করে বসেছিলো, সেইটাই অশ্চর্যের বিষয়। এটা সত্য কথা যে, বৃটিশ সামরিক পক্ষ সমুদ্রপথে শত্রুর আগমন আশঙ্কা করেই সিঙ্গাপুরকে সুরক্ষিত করে ছিলেন, তাঁরা হয়তো মোটেই আশঙ্কা করেন নি, স্থলপথে এসে জাপান সিঙ্গাপুর অধিকার করতে পারে। তাই তো দেখেছি সিঙ্গাপুরের বিরাট আঠারো ইঞ্চি কামানের মুখ সমুদ্রের দিকে। বহু কষ্টে মাত্র বারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ এসব কামানের মুখ দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে ফেরাতে সমর্থ হয়।

বিকালে আমরা 'টেনিকট' অথবা ভলিবল খেলতাম। এই একমাত্র খেলবার উপাদান, আমরা কোনও উপায়ে জোগাড় করেছিলাম। যদিও এই উপায়টিকে ঠিক বৈধ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। সন্ধ্যার পর থেকে আলো না নেভানো পর্যন্ত চলতো তাস খেলা।

ক্রমে সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এবং কতদিন যে

এ জীবন যাপন করতে হবে তা অজানা থাকাতে অন্যান্য সব রকম পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলতাম। এমন কি ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য খানিকটা জায়গাতে লাউ কুমড়োর গাছ পর্যন্ত লাগিয়ে দিলাম। এখানে জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো না এইটেই ছিল বড় সুবিধা। যখন 'ফেটিগ' অথবা অন্য কিছু দরকার পড়তো জাপানীরা আমাদের অফিস থেকেই তা সংগ্রহ করতো। তারা অফিস ঘর ছাড়া কখনও আমাদের ক্যাম্পের ভিতরের অন্য জায়গাতে আসতো না। বাইরে বেরানো একেবারে নিষিদ্ধ হলেও বিশেষ প্রয়োজনে সিঙ্গাপুর বাজারে যাওয়ার জন্য পাশের বন্দোবস্ত ছিল; তাছাড়া সিপাহীরা অবশ্য তাদের সুবিধা মতো তারের মধ্য দিয়েই বাইরে যাবার রাস্তার বন্দোবস্ত করেছিলো। একবার ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর বক্তৃতা হয়। সেইদিনই প্রথম তাঁকে দেখি। তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস না থাকলেও বেশ গুছিয়ে জোরের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য যেভাবে বললেন,তা' সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। তখনও আস্তে আস্তে অল্প অল্প লোক আমাদের ক্যাম্প থেকে "আই, এন, এ"-তে যোগদান করছিল। আমরা তখন পর্যন্তও কিংকর্তব্য ভেবে স্থির করতে পারি নি; কাজেই চুপচাপ সব কিছু শুনছিলাম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম। একদিন রাসবিহারী বসু ও মোহন সিং দুজনেই রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেলেন। আমাদের উপর হুকুম হয়েছিলো, রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকবার।

সেইদিনই প্রথম রাসবিহারী বসুকে দেখলাম। তাঁরা আমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন নি, বা কোনও বক্তৃতাও তখন হয়নি। তাঁরা চলে যাওয়ার পর আমরা ক্যাম্পের ভিতরে ফিরে এলাম।

রোগী নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে চার নম্বর হাসপাতালে বেড়াতে যেতাম। সেখানে ডাঃ বীরেন রায়, জ্ঞান দাশগুপ্ত, হেম মুখার্জি প্রভৃতি আমার পরিচিত কয়েকজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন। জ্ঞান বেশ ভালো গান গাইতে পারতো, মাঝে মাঝে তার গান শুনতাম। এমনিভাবেই দিন কেটে চলেছে। আমাদের ক্যাম্প থেকে একজন ডাক্তার অন্য ক্যাম্পে বদলি হবে এবং কে যাবে তাই নিয়ে আলোচনা চলছিলো। শেষে আমাদের ডাঃ শচীন দত্তই বদলী হয়ে গেল 'টেঙ্গা এরোড্রোমে। অনেকদিন এক সঙ্গে ছিলাম এখন ছাড়াছাড়ি হওয়ায় মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। শুনলাম এক মাসের জন্য সে যাচ্ছে। একমাস পরে অন্য একজন পাঠানো হলে সে ফিরে আসবে। আমাদের ঘরে রয়ে গেলাম শুধু আমি আর ডাঃ রে। কিছুদিন এইভাবেই কেটে গেলো। প্রথমটা ভবিষ্যতের ভাবনায় মনের সব শান্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, এমন করে দিন কাটবে কি না? কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত হলাম ও জীবনে সব কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেলো। এখন ক্যাম্পের ভিতরে হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ এলে বুঝতেই পারবে না যে এদের মনে কোনও কষ্ট আছে। কোনও ঘরে কেউ হয়তো তাস

নিয়ে বসেছে, কেউ হয় তো মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ নিজের মনে গান গাইছে, আবার কেউ হয়তো আপন মনে 'পেসেন্স' খেলছে এক কথায় সকলেই যেন কোনও কাজে মনোনিবেশ করে সময় কাটাবার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরের পাশে প্রায়ই লেগে আছে ড্রামা। যদিও সাজ সরঞ্জামের অভাব, তবু সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ নয়। অবশ্য এগুলি বিশেষ করে সাধারণ সৈনিকেরই আনন্দ দেবার জন্য, এতে উচ্চাঙ্গের আর্ট আশা করা যায় না, অশ্লীলতার ভাগই বেশী।

এমনিভাবে সময় কেটে চলেছে। বাড়ির কথা ভোলবার চেষ্টা করি। কিন্তু সারাদিন কাজে গল্পে তাস খেলা প্রভৃতিতে কেটে গেলেও রাতে বিছানায় শোবার পর অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। সেই ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে চিঠি দিয়েছিলাম, তারপর আর কোনও খবর দিতে পারি নি। বাড়ির লোকেরা আজ জানে না আমি মৃত না জীবিত। শুনেছি অষ্ট্রেলিয়ান ও বৃটিশদের রেড ক্রশের মধ্যস্থতায় চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলছে, কিন্তু পরাধীন ভারতবাসীর সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া হয়তো আকাশ কুসুম কামনা করা। তাই কতোদিন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির কথা চিন্তা করে মন একেবারে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন বাইরের মাঠে পাতা একটি বেঞ্চে বসে বসে নীরবতার মাঝে শান্তি লাভের চেষ্টা করি। এই তো কাছেই একটি সিভিলিয়ান 'মেণ্টাল' হাসপাতাল। ইতিমধ্যে আমাদের বন্দী

শিবির থেকে কয়েকজন তার মধ্যে স্থান পেয়েছে, ভবিষ্যতে আরও কিছু সেখানে নিশ্চয়ই স্থান পাবে। চিন্তায় মানুষ পাগল হয়ে যায়, এ কথা সত্য। দুর্বিষহ জীবনের ভার বইতে না পেরে মানুষ তো আত্মহত্যাও করছে। মনকে কঠিন করার চেষ্টা করি। গভীর রাতে আবার ঠাণ্ডা জলে হাত পা ধুয়ে ঘুমের চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে নিদ্রার কোলে লুটিয়ে পড়েও স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পাই না। দিনের চিন্তাগুলি মনের মধ্যে উঁকি মেরে রাতে নিদ্রার মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে দেয়। তাই গভীর রাতে অনেক সময়ে পাশের বিছানাতে ঘুমন্ত সঙ্গীদের মুখ থেকে তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের নাম মাঝে মাঝে শুনতে পাই।

এক মাস পরেই শচীন আবার আমাদের এখানে ফিরে এলো। তার কাছেই সেখানকার 'ফেটিগ' ও জাপানীদের ব্যবহারের কথা সবাই শুনতে পেলাম। টেঙ্গাতে বৃটিশের একটি এরোড্রোম ছিলো, জাপানীরা সেইটিকে একটি বিরাট এরোড্রোমে পরিণত করছে, হাজার হাজার ভারতীয় বন্দী সেখানে দিবারাত্র কাজ করছে। পাথর ভেঙ্গে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। প্রত্যেককে দশ বারো ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। ক্যাম্প থেকে শতকরা নব্বুইজনকে কাজে যেতে হয়। কাজেই রান্না কাড়ার লোক, ডাক্তার ও রুগীদের পর্যন্ত বাদ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারপর লোকেরা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর, জাপানীরা ক্যাম্পের ভিতরে এসে দেখে যায় কেউ বাদ

পড়েছে কিঁ না। পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাত কেটে রক্ত পড়েছে তবু কাজ করতে হবে। তারপর জাপানীদের ভাষা কেউ বোঝে না, কাজেই তাদের কথা মতো ঠিক কাজ না হলে চড় চাপড়ও সহ্য করতে হয়। শুধু এই ভাষাগত পার্থক্যের জন্যই এদের কাছে অনেক সময় নানা রকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। লোকেরা বিরক্ত হয়ে পড়ে, এতো কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব। রণজিৎ ভট্টাচার্য নামে একটি বছর কুড়ির ছেলে আগে কেরাণী ছিল, তাকেও সেখানে কাজ করতে হত। অনেকেই ডাক্তারের কাছে এসে দু'একদিনের বিশ্রামের জন্য ছুটি চাইতো, কিন্তু বিশেষভাবে অসুস্থ না হলে ডাক্তারও কোন সাহায্য করতে পারতো না। রণজিৎ এতো কষ্ট সহ্য না করতে পেরে শচীনকে বললে, ডাক্তারবাবু আর সহ্য হয় না। এবার এখান থেকে পালাবো তারপর ভবিষ্যতে যা হয় দেখা যাবে। সত্যই সে একদিন সুবিধা মতো ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল, অবশ্য তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। এমনিভাবে ক্যাম্প থেকে কিছু লোক বাইরে পালিয়ে গিয়েছিল। টেঙ্গা ক্যাম্পে এই কঠিন ফেটিগের কাজে বহুলোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামান্য এক পাউণ্ড মাত্র চাউল তার উপর দশবারো ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম সহ্য করা যে কতোটা কঠিন তা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারে না! এই কঠিন পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অনেকে হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিতো তারপর একটু সুস্থ হোলে হয় বাহিরে পালিয়ে গিয়ে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের সাথে মিলে [illegible]

নয়তো আই, এন, এতে, যোগদান করতো। বাস্তবিক পক্ষে এছাড়া তাদের বাঁচবার অন্য কোনও উপায় ছিলো না।

সব দিকেই এমনি ধারা 'ফেটিগে'র কাজ। যাদের রাস্তা পরিষ্কার করতে পাঠাতো তাদেরও বহুদিনের পচা মড়া লরীতে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে হত। এমন কি, বহুলোককে পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হয়েছে। শুধু ভারতীয় বন্দীদের যে এভাবে কাজ করতে হোত তা নয়। বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান বন্দীদের কাছ থেকেও জাপানীরা এইভাবে ফেটিগের কাজ নিতো। যুদ্ধ জয় করার পর জাপানীরা সিঙ্গাপুরে এক বিরাট স্মৃতি-মন্দির গড়ে তুলে। এখানেও তারা বন্দীদের কাছ থেকে খুব শ্রমসাধ্য কাজগুলি আদায় করতো পাথরভাঙ্গা, মাটী কাটা, মাটী আনা, প্রভৃতির কাজ করতো-বৃটিশ ভারতীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান বন্দীরা। দত্ত ফিরে আসার পর আবার আমাদের দিন এক রকম ভালভাবেই কাটতে লাগল। এক সঙ্গে মিলে মিশে মানুষ সব কিছুই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে, কিন্তু সঙ্গীহীন অবস্থায় দুঃখ যেন ভীষণরূপ ধারণ করে। এইবার আমাদের ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন কর্মকার এসে উপস্থিত হলেন। ইনি হচ্ছেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ভূপেশ কর্মকার। যুদ্ধের সময় ইনি ইপোর কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। জাপানীরা যখন এগিয়ে আসে তখন তিনি একটি রবার জঙ্গলে। সেখানে একটি রবার ফ্যাক্টরীর বাঙালীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি সেখানেই থেকে যান। প্রায় ছ' মাস তিনি সেখানেই সিভিলিয়ানদের

সঙ্গে কাটান। তারপর জাপানীরা এক ঘোষণাপত্র জাহির করে যে, যেখানে যতো ভারতীয় এখনও সিভিলিয়ানদের সঙ্গে মিশে আছে তারা সত্বর যেন বন্দীশিবিরে এসে রিপোর্ট করে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী তিনি আমাদের ক্যাম্পে আসেন। তখন ৩৬নং ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এ অন্য কোনও বড় অফিসার না থাকাতে তিনিই তাদের কমাণ্ডার হন। তাঁর স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর ছিলো, কিন্তু ক্যাম্পের এক পাউণ্ড রেশন তাঁর পক্ষে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল। তিনি আসার পর আমাদের কাছে রোজই দুপুরে ও সন্ধ্যায় তাস খেলতে আসতেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের ঘরোয়া তাসের আড্ডা বেশ ভালোভাবেই জমে উঠলো।

এমনিভাবে এই ক্যাম্পেও প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেলো। অনেক রেজিমেণ্ট এলো আবার অনেকে চলে গেলো। এদের মধ্যে আমি অনেকের সঙ্গেই আগে কাজ করেছি। পরে এই ক্যাম্পে এলো বেলুচ রেজিমেণ্ট। প্রায় এক বছর এদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এদের ডাক্তার ক্যাপ্টেন সত্যেশ ঘোষের সঙ্গেও অনেকদিন পরে দেখা হ'ল। মাঝে মাঝে এই ক্যাম্প থেকেও বাইরে 'ফেটিগ' পার্টি পাঠানো হচ্ছে কাজেই খুব বেশী দিন এখানে থাকা সম্ভবপর হবে বলে মনে হ'ল না। জাপানীরা বাহিরের ফেটিগ পার্টির জন্য তিনশো বা চারশো লোকের এক একটী দল তৈরী করতো। এতে অনেকগুলি রেজিমেণ্টকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হোত। এই ব্যবস্থাতে অনেকে আপত্তি করে। তাদের ইচ্ছা যেখানে তারা ফেটিগের কাজে নিয়ে যাবে

সেখানে যেন পুরো একটি ইউনিট নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক সিপাহী নিজেদের পুরাতন অফিসারকে ছেড়ে নূতন অফিসারের সঙ্গে নূতন দলে যাওয়া পছন্দ করতো না! এই ব্যবস্থার জন্য প্রথম প্রথম বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এমনকি 'রিভার ভ্যালী ক্যাম্পের' একটী ইউনিট এর প্রতিবাদে অনশনব্রত পর্যন্ত আরম্ভ করে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানীর ব্যবস্থাই চালু হয়ে যায়। প্রায় ছ' মাস পরে একদিন শুনলাম, আমরা কিছু পয়সা পাবো। সকলেই খুব উৎসুক হয়ে পড়লো—যাক এতদিন পরে তবু জাপানীদের মতি ফিরেছে। কিন্তু পাওয়ার সময় দেখা গেলো, প্রত্যেকের ভাগেই পড়েছে এক ডলার করে। সিপাহী থেকে শুরু করে লেঃ কর্নেল পর্যন্ত। একটি মাত্র ডলার। কিন্তু সেদিন তাতেই আমাদের যা আনন্দ হয়েছিলো হয়তো অন্য সময়ে পাঁচশো টাকাতেও সে আনন্দ পাইনি। সেই ডলার পাওয়ার পর আমাদের আবার বাজেট শুরু হ'ল। একটী মাত্র ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় একটী টাকা তারই আবার 'বাজেট'? কিন্তু বর্তমানে-আমরা যে দুরবস্থায় পড়েছি তাতে নানা অসম্ভব জিনিষও সম্ভবে পরিণত হয়েছে কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কতোটা পয়সার সব্জী, কতোটার সিগারেট কেনা হবে। কারণ একমাত্র ঐ দুটি ছাড়া পয়সার অন্য খরচ ছিল না। জাপানীরা যদি আন্তর্জাতিক আইন মানতো তাহলে আমাদের পাওনা হত মাহিনার চারভাগের এক ভাগ। তা' ছাড়া আমরা প্রতি মাসে একটি চিঠি পাওয়া ও

দেওয়ার অধিকারী হ'তে পারতাম। সে অবস্থায় আমাদের বন্দী জীবনেও যথেষ্ট সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত আমরা করতে পারতাম। শুনলাম রেডিও মারফৎ আমাদের বাড়িতে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। প্রতিদিন দশজনের নাম ব্রডকাস্ট করা হবে। সেই হিসাব অনুযায়ী পঁয়ষট্টি হাজারের নাম পাঠাতে যে কতোদিন সময় লাগতে পারে তার হিসাব করা মোটেই কঠিন নয়। যাই হোক তালিকার মধ্যে নাম দিয়ে দিলাম। কোনদিন হয়তো বাড়িতে খবর পৌঁছাতেও পারে।

এবার শুনলাম খুব শীঘ্রই চারশো লোকের একটি 'ফেটিগ' পার্টি বাইরে যাবে। ডাক্তার যাবে দু'জন—আমি ও ডাঃ বীরেন মজুমদার। আদেশপত্র আমার কাছে এসে পৌঁছাল —ক্যাম্পে সর্বদা তৈরী থাকবে। রোজ সকাল ন'টায় আমি ভাত খেয়ে বিছানা বেঁধে তৈরী হয়ে থাকতাম, কিন্তু চার পাঁচ দিনেও যাওয়া হয়ে উঠলো না। একদিন তৈরী না হয়েই ঘরে বসে বই পড়ছি এমন সময় আফিস থেকে খবর এলো—এক্ষুণি তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকজন জাপানী একটি লরী এনেছে। কাজেই তাড়াতাড়ি বিছানা বেঁধে ইউনিফরম পরে তৈরী হলাম। অপরের কাছে বিদায় নেবার সময় ছিল না, কাজেই শুধু দত্ত ও রে'র কাছে বিদায় নিয়ে আফিসে এলাম। একজন জাপানী ক্যাপ্টেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলতে জানে, আমাকে লরীতে উঠতে বললে।

ক্যাম্পে পুরো ছ'টি মাস কাটিয়েছি। কাজেই ছাড়তে একটু মন খারাপ লাগছিলো। নূতন জায়গাতে চলেছি। জানি না সেখানকার আবহাওয়া আবার কেমন হবে। পরিচিতদের ছেড়ে এবার যেতে হবে অপরিচিতদের মাঝে। তারপর জাপানীদের সঙ্গে থাকতে হবে কাজেই প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার হ'ল সে কথাও সত্য। যাই হোক এটাও আমার ঘর নয়। বিদেশে যখন এসেছি, ভাগ্য পরিবর্তন যখন হয়েছে, তখন আর সামান্য ক্যাম্প ছাড়ার দুঃখে কাতর হলে চলবে কেন। কাজেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মুখে হাসি টেনে নূতন জীবন যাপন করবার জন্য তৈরী হয়েই চললাম।

জহোর বারু—

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সলিতা থেকে জহোর বারু এসে উপস্থিত হলাম। আমার আসার কয়েকদিন আগেই প্রায় চারশো লোকের এক 'ফেটিগ পার্টি' এখানে পৌঁছেছে। একমাত্র অভাব ছিলো ডাক্তারের—তা আমিও এসে পৌঁছলাম। সমুদ্রের তীরেই আমাদের থাকবার স্থান। এখানকার বড় মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংএ আমাদের লোকজন ও অন্য অফিসাররা থাকতো। পাশের একটি বড় বাংলোতে আমার থাকার স্থান এবং সেই সঙ্গে রুগীদেরও রাখার ব্যবস্থা হলো। সমুদ্রের তীরেই পিচঢালা রাস্তা আর সেই রাস্তার উপরই আমার বাংলো। জায়গা দেখে সত্যিই প্রাণে খুব আনন্দ হলো। মালয়ের চীন সমুদ্রের তীরে প্রায় এক বছর কাটিয়েছি বন্দী হওয়ার আগে।

এখানে আমি ছাড়া আরও পাঁচজন অফিসার ছিলেন। তাঁরা সকলেই বড় বাড়িটাতে থাকতেন। এখানে আমাদের জন্য কাঁটাতারের বেড়া বা জাপানী রক্ষী এ সব কিছুই ছিলো না! ক্যাপ্টেন আমাথানি নামে একজন অফিসার ও তার সঙ্গে পাঁচজন জাপানী এন-সি-ও এবং সিপাহী ছিলো। তারা আমাদের লোকদের লরী করে 'ফেটিগের' কাজে বাইরে নিয়ে যেতো আবার ফিরিয়ে আনতো। এখানে 'ফেটিগে'র কাজ

খুব কঠিন ছিলো না। সকালে যারা বাইরে যেতো, প্রায় একটা দেড়টার সময় তারা ফিরে আসতো, আবার অন্য দল বেলা দু'টোর সময় বাইরে যেতো, ক্যাম্পে ফিরে আসতো ছ'টার সময়। কাছাকাছি এক জায়গাতে সমুদ্র তীরে জাপানীদের একটি 'স্মৃতি মন্দির' তৈরী হচ্ছে। আমাদের লোকেরা লরী ভর্তি করে সেখানে ইট মাটি প্রভৃতি এনে যোগাড় করে দিতো, রাজমিস্ত্রীরা গাঁথুনির কাজ করতো। এখানে জাপানীদের ব্যবহার অনেকটা ভালো ছিলো। ক্যাপ্টেন আমাথানি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলতে পারতো, কাজেই ভাষা বোঝবার পক্ষে আমাদের খুব অসুবিধা হতো না। এখানে আমার কাজ প্রায় কিছুই ছিলো না। সকালে যে কয়েকজন রুগী আসতো তাদের ওষুধ দিতাম ও ছুটির বন্দোবস্ত করতাম। তারপর সারাদিন অখণ্ড বিশ্রাম। পড়বার মতো কোনো বইও ছিলো না কাজেই একমাত্র ঘুমানো ও সন্ধ্যার পর নীরবে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি শোনা ছাড়া আর কিছু করবার ছিলো না। এদের এই দলে সুকুমার বসু নামে এক বাঙালী যুবক ছিলো। তার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ আলাপ জমে উঠলো। কাজেই বাঙলায় কথা বলার মতো একজন সাথী পেলাম।

এখানে আসার পর আমাদের রেশনেরও কিছু উন্নতি হয়। টাটকা সজী আমরা পেতাম, আর মাঝে মাঝে পেতাম টাটকা মাছ। তা'ছাড়া একদিন জাপানীরা আমাদের জন্য কিছু মাংসও নিয়ে আসে যা' ছিলো হিন্দুর অখাদ্য। কিন্তু শুধু হিন্দু নয়

মুসলমানেরাও সে মাংস অগ্রাহ্য করে কারণ তা' কি ভাবে কাটা হয়েছে তা সকলের অজানিত। কাজেই আমরা জাপানীদের জানালাম যে আমরা মাংস চাই না! জাপানী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেন? তাকে ঠিকভাবে বুঝানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব; কাজেই সোজাভাবে জানালাম ইণ্ডো no eat. তারপর অবশ্য আর কোনওদিন ক্যাম্পে মাংস আসে নি। সমুদ্রে প্রথমে আমাদের স্নান নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু জাপানী অফিসারকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই চর্মরোগে ভুগছে তাদের পক্ষে সমুদ্র স্নান বিশেষ উপকারী। তখন মাঝে মাঝে সমুদ্র স্নানের ছুটি পাওয়া যেতো। বাইরে সাধারণত যাবার হুকুম ছিলো না, তবে জিনিসপত্র কেনার জন্য ছুটী চাইলে সময় সময় তা পাওয়া যেতো।

এখানে ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত ছিলো, কাজেই সন্ধ্যার পর এখানেও তাস খেলে সময় কাটাতাম। আমি ও সুকুমার ছাড়া আসামের লংরোট সিং ও অন্যজন মাদ্রাজের মাধবন। বলা বাহুল্য, অন্য অফিসারেরা কেউ ব্রিজ খেলা জানতেন না। রাত দশটায় শোবার সময়। এরপর বিশেষ জরুরী দরকার ছাড়া আলো জ্বালানো একেবারেই নিষেধ। আমাদের আগে এখানে একটি গাড়োয়ালী পল্টন ছিলো। তাদের ব্যবহারে জাপানীরা সন্তুষ্ট ছিলো বলে আমাদের সাথেও তারা ভালো ব্যবহারই করতো। আমি যেখানে থাকতাম, আগে সেখানে গাড়োয়াল পল্টনের সঙ্গে একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন।

সমুদ্র তীরে নীরবে থাকতে থাকতে মনে হয়তো কতকটা ভাবের উদয় হয়েছিলো তাই সেগুলি দেওয়ালের এক জায়গাতে স্থান পেয়েছিলো পেন্সিলের রেখায়। আমিও সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসতাম—লিখে রাখতাম আমার দুঃখপূর্ণ জীবনের কাহিনী। সে কাহিনী যে আবার কেউ পড়বে সে ধারণা মোটেই করিনি। নিছক সময় কাটাবার জন্যই কাগজ ভর্তি করেছি।

এখানে কাজ করার জন্য আমরা হাত খরচ বাবদ কিছু টাকা পেতাম। সিপাহীরা পেতো তিন টাকা আমি পেতাম দশটাকা। শুনলাম এরা আমাদের একটা মাহিনা ধরেছে তার থেকে খাওয়ার খরচ কেটে যা বাঁচতো তাই আমাদের দিতো। খাওয়ার খরচ কাটতো নাকি মাসিক ষাট টাকা হিসাবে। যাই হোক, না পাওয়ার চাইতে কিছু পাওয়া ভালোই হিসাবে আমরা এই টাকা সাদরে গ্রহণ করতাম।

সমুদ্রের অন্তহীন কল্লোল ধ্বনির মধ্যে মানুষের প্রাণে সান্ত্বনা দেওয়ার যে কি শক্তি আছে তা তখন অনুভব করেছি। কাব্য করার মতো মানসিক অবস্থা নয় কিন্তু তবু এই নির্জন সমুদ্রতীরে অনেকখানি মনের শান্তি পেয়েছি! আবহমানকাল থেকে চলেছে এই কল্লোলধ্বনি, কোথায় যে এর শুরু আর কোথায় যে এর পরিণতি তার সন্ধান আজ পর্যন্ত কেউ পেয়েছে কি? অনেক নৌকা নিয়ে মালয়ীরা মাছ ধরছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও একটি দুটি ছিপ হাতে নিয়ে মাছ ধরছে সমুদ্রতীরে।

জাপানী বন্দী শিবিরে

সামনের পথ দিয়ে যারা প্রতিদিন যাতায়াত করে তাদের যাওয়া আসার সময় ঠিক জানা হয়ে গেছে ও তাদের মুখও পরিচিত হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সকাল দশটায় একজন শিক্ষয়িত্রী যাবে রিক্সা চড়ে, সঙ্গে একটি বছর দশেকের ছেলে। তারপর যায় স্যুট পরা কয়েকজন চীনা। এরা হয়তো কোনও আফিসে কাজ করে। তাছাড়া সাইকেলের পিছনে বড় বড় বস্তা বেঁধে চলে বহু চীনা ব্যবসায়ী। অদ্ভুত এই চীনা ব্যবসায়ীরা। সাইকেলের পিছনে এরা দুমণ ওজনের বস্তা অনায়াসে ব'য়ে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল। এদেশে কঠিন পরিশ্রমের সব কিছু কাজ চীনারাই করে। এদের তুলনায় মালয়ীরা একেবারেই অলস ও আরামপ্রিয় জাতি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু পথের পানেই চেয়ে থাকতাম। ভাবতাম এদের তবু বাইরে চলাফেরা করার ক্ষমতা আছে, আমাদের সেটুকু স্বাধীনতাও নেই, আমরা যে বন্দী। বন্দী অথচ ঘরের সামনে কোন প্রাচীরের বাধা নেই, নেই কোন কাঁটাতারের বেড়া। তবু ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার অধিকারটুকু থেকে আমরা বঞ্চিত। ইচ্ছা করলেই যে কেহ অনায়াসে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়। অসীম সমুদ্র বাধা সৃষ্টি না করলে হয়তো এ-ভাবে খোলা ক্যাম্পে আমাদের রাখা জাপানীদের পক্ষে সম্ভবপর হোত না! সমুদ্রের অপর তীরেই সিঙ্গাপুর দ্বীপ। এখান থেকে দ্বীপ দেখা গেলেও বাড়ি ঘর কিছুই নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে মনে শান্তি পাই,

মাঝে মাঝে নীরবতার মাঝেও প্রাণ কেঁদে উঠে। মনে পড়ে অন্ধ কবি হেমচন্দ্রের—

"হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী।
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহায়
কেন রজনীতে পুন প্রাণ উঠে জ্বলে
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়!
কেন বা উৎসবে মাতি—থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায়।"

তবু তো আমাদের ভাগ্য শতগুণ ভালো যে এমন সুন্দর সমুদ্র-তীরে এমন সুন্দর বাংলোতে বাস করছি। তা ছাড়া আরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে, যেহেতু এখানকার জাপানীদের ব্যবহার একেবারে খারাপ নয়। বন্দী জীবনেও যে এতটা সুখ সুবিধা ভোগ করতে পারবো সে তো কল্পনাতীত। থাকা খাওয়ার এখানে কোনও কষ্ট নেই। খুব বেশী কাজেরও চাপ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে যখন অন্য বন্দীদের কথা ভাবতাম তখন মনে হোত আমরা তো আছি রাজার মতো!

এখানে একারাশি নামে একজন জাপানী ছিলো। সে ইতিপূর্বে গাড়োয়ালীদের কাছ থেকে অল্প অল্প হিন্দুস্থানী

শিখেছে। আমার কাছে প্রায় রোজ সন্ধ্যাতেই আসতো। তার কাছ থেকে আমিও অল্প অল্প জাপানী ভাষা শিখতে শুরু করলাম। ভাষা বেশ কঠিন আর অক্ষর পরিচয় তো একেবারেই অসাধ্য সাধন। শুনলাম এদের প্রায় চার হাজার অক্ষর আছে। যারা খুব উচ্চ শিক্ষিত তারাও মাত্র তিন হাজার অক্ষর চেনে। কাজেই সেদিকটা বেমালুম বাদ দিয়ে সাধারণ কথাবার্তা শিখতে শুরু করলাম। পরিবর্তে আমিও তাকে মালয়ী ভাষা শেখাতে লাগলাম। জাপানীদের বিদেশী ভাষা শিখতে খুব বেশী দেরী লাগে না। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত। জাপানী ভাষা এরা সকলেই জানে আর যারা স্কুল থেকে পাশ করেছে তারা সকলেই অল্প অল্প ইংরেজী জানে কিন্তু চর্চার অভাবে তা একবারেই অকেজো হয়ে পড়েছে।

এখানে জহোরের সুলতান একটি বিরাট হাসপাতাল তৈরী করেন। শুনেছি এটা নাকি পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। মাঝে মাঝে ওষুধ আনবার জন্য আমাকে এই হাসপাতালে যেতে হ'তো। আমাদের বাংলো থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। প্রথমে বৃটিশ এই হাসপাতাল অধিকার করে। পরে জাপানীরা এখানে তাদের মিলিটারী হাসপাতাল খোলে। এই হাসাপাতালে প্রায়ই রুগীদের আনন্দ দেবার জন্য সিনেমা, থিয়েটার ও নাচ হতো। আমাদের জাপানী অফিসার মাঝে মাঝে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতো। একদিন সেখানে সিনেমা দেখলাম— "Way to Singapore"—জাপানীরা কিভাবে প্রথম থেকে

মালয় আক্রমণ ক'রে শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর অধিকার করে তারই ছায়ারূপ। কিভাবে বৃটিশ পশ্চাদপসরণ করে, কি করে জেনারেল পারসিভ্যাল জেনারেল ইয়ামাসিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার ছবি দেখলাম। আট মাস পূর্বে আমরাও এই যুদ্ধে ছিলাম, আজ আবার বহুদিন পরে সিনেমা দেখেই প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মালয়ে রুগীদের চিত্তবিনোদনের জন্য টোকিও থেকে কয়েকটি তরুণী আসে। তারা প্রায় মালয়ের প্রত্যেক স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করে। এখানকার সিনেমা হলে একদিন এই দলের নাচ গান হয়। আমাদের জাপানী অফিসার আমাদের শুধু অফিসারদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়। নাচ-সম্বন্ধে আমার নিজস্ব বিশেষ কিছু ধারণা নেই। ' তবে একবার উদয়শঙ্করের নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। কাজেই সেই তুলনায় এদের নাচও যে বেশ উচ্চাঙ্গের তা মানতে হয়। গানগুলি অবশ্য মোটেই বুঝতে পারিনি। পোষাকের বেশ জাঁক জমক আছে। মাঝে মাঝে এইভাবে আমরা বাইরে যেতে পেতাম ও আমোদ-প্রমোদে যোগদান করতে পেতাম।

আমার রুগীদের মধ্যে যাদের অসুখ গুরুতর বলে মনে হতো, তাদের টারসেল পার্ক হাসপাতালে ভর্তি করতাম। জাপানী অফিসার আমার সঙ্গে যেতো, অবশ্য নিজের গাড়ীতে। ফেরবার সময় সে অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতো কাজেই খাওয়ার কাজটা সারতে হতো'কাফেতে'। জাপানীরা আসার পর সিঙ্গাপুরের নাম হয়েছে 'সাইনন'। এখানে এখন প্রত্যেক কাফেতে তরুণীরা

কাজ করে। চীনা, ইউরেসিয়ান, মালয়ী প্রত্যেক জাতির তরুণীই দেখা যায়। পথে সব খানেই জাপানীদের ভীড়। তারাই এখন দেশের রাজা কাজেই তাদের সর্বত্রই যথেষ্ট সম্মান। দোকানীরা চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি অভিবাদন করে 'ওহায়েও গোজাইমাস', অর্থাৎ প্রাতঃপ্রণাম। অন্যান্য জাতির লোকেরা জাপানীদের পরে জিনিসপত্র পায়। ইতিমধ্যেই বহু দোকানী কাজ চালাবার উপযুক্ত বেশ সুন্দর জাপানী ভাষা শিখেছে।

খাদ্যদ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকরূপে বেড়েছে। দরকারী খাদ্য-দ্রব্য সবই জাপানীরা 'কনট্রোল' করেছে। চিনি মাথা-পিছু এক কাটি অর্থাৎ দশ ছটাকের মতো। চাউল ছয় গান্টাং অর্থাৎ একমাসে প্রায় পৌণে চার সের। এই সামান্য চাউলে কারও চলতে পারে না, কাজেই উদর পূরণ করার উপায় হচ্ছে 'উবি' (আমাদের দেশের রাঙাআলু) ও অন্যান্য সব্‌জী। জাপানী কৃষিবিভাগ থেকে প্রত্যেকের উপর আদেশ হয়েছে তারা যেন নিজ নিজ জমিতে শাকসব্‌জীর ক্ষেত করে। "অধিক সবজী উৎপন্ন করো"—এই নোটিশ সব জায়গাতেই লাগানো আছে। শুধু নোটিশ লাগিয়েই তারা ক্ষান্ত হয় নি। জাপানী কৃষি-বিভাগের সিপাহী ও অফিসাররা নিয়মিয়তভাবে দেখা শোনা করতেন। যেখানে আদেশ মতো কাজ হয় নি, সেখানে তারা বল প্রয়োগ করে তাদের সবজী রোপণ করিয়ে ছাড়ত। কাজেই চালের অভাব হলেও প্রকৃত পক্ষে উদর পূরণ করা খুব কঠিন ছিলো না! এ বিষয়ে জাপানীরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে

সুর কাজ করতো। বড় বড় বাগানের সব জায়গাতেই শাক-সবজী লাগানো হয়েছে ; এমন কি শুনেছি গভর্ণরের বাড়িতে পর্য্যন্ত ফুলবাগান তুলে ফেলে কলা, শাক, সবজীর বাগান তৈরী হয়েছে। কনট্রোলে জিনিস কম পাওয়া গেলেও চোরাবাজারে সব জিনিসই একটু বেশী দামে পাওয়া যায়। চীনাদের কাছে প্রায় সব জিনিসই আছে এবং চোরাবাজারও চালায় তারাই। সিঙ্গাপুরে কোন জিনিষেরই অভাব ছিলো না। তারপর বৃটিশ এখান থেকে পিছু হঠতে পারে নি বলে তারা পোড়া মাটীর নীতিও অনুসরণ করতে পারে নি! যুদ্ধের শেষদিকে চীনারা প্রায় সব জিনিষই লুঠ করে লুকিয়ে রাখে তারপর আস্তে আস্তে চোরাবাজারে সব কিছুই অধিকদামে বিক্রি সুরু করে। সাইনন শহরে আগের মতো দোকানপসার সবই খুলেছে। তেমনি জাঁকজমক। তারপর যুদ্ধের সময় যে সব বাড়িঘর ভেঙেছে, বর্তমানে হয় সেগুলি একেবারে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, নয়তো সেগুলি একেবারে সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই যুদ্ধের ছ'মাস পরেই সিঙ্গাপুর শহরের যুদ্ধের ক্ষতিগুলি মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোমা পড়ার দরুণ যেসব বড় বড় গর্ত হয়েছিল, সেগুলিও ভর্তি করে ফেলা হয়েছে। বাহিরের এই সমস্ত ক্ষতি পূরণ সম্ভবপর হোলেও অবশ্য এই বিভীষিকাময় যুদ্ধের স্মৃতি তাদের মন থেকে কিছুতেই মুছবে না—যারা প্রত্যক্ষরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে, হারিয়েছে তাদের নিতান্ত প্রিয় আপনার জনকে।

২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব। স্থানীয় ইণ্ডিয়ান

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের উদ্যোগে একটি বিরাট সভা হয়। এই সভাতে স্থানীয় সমুদয় হিন্দুস্থানী যোগদান করে। আমাদের জাপানী অফিসার আমাদের এই সভায় যোগ দিতে বলে। আমরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কয়েকজন বক্তা মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তৃতা করেন। তা'ছাড়া আরও কিছু কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। এখানে কোনও বাঙালী আছে কিনা খোঁজ করে জানলাম—ডাঃ মিত্র নামে একজন বাঙালী এখানে সপরিবারে বসবাস করেন। অল্পক্ষণ পরে ডাঃ মিত্রের সাথে আলাপ হয়। সুন্দর স্বাস্থ্য—সাধারণত ঐ চেহারার বাঙালী বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন পরে তিনি নিজেই সপরিবারে আমার ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলেন এক সন্ধ্যায়। ডাঃ মিত্র, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে লক্ষ্মী ও ছেলে জয়ন্ত। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে আলাপ জমিয়ে নিতে মোটেই দেরী হয়নি। একমাত্র চা করে খাওয়ানো ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। রাত প্রায় ন'টা পর্য্যন্ত নানা গল্প করে ও আমাকে তাঁদের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে তাঁরা সে রাতে বিদায় গ্রহণ করলেন। অনেক-দিন পরে আজ প্রাণে সত্যই অনেকখানি শান্তি পেলাম। কোথায় বাঙলাদেশ আর কোথায় এই মালয়ের 'জহোর বারু'। তবু এর মধ্যেও বাঙালীর সঙ্গে মিশে আজ বার বার মনে পড়ছিলো, বাঙলার এক প্রান্তে আমার সেই ছোট্ট কুটীরখানির কথা।

কয়েকদিন পরে একদিন তাঁদের বাড়ী যাওয়ার জন্য জাপানী অফিসারের কাছে অনুমতি চাইলাম। কার সঙ্গে দেখা করবো, আমার কে হন তিনি, কি দরকার প্রভৃতি নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, "আচ্ছা আসছে রবিবার আমি বাইরে যাব না, ঐদিন আমার গাড়ি নিয়ে যেও।" আমাদের ক্যাম্প থেকে ডাঃ মিত্রের বাড়ি প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ। সকাল থেকেই আমি ও সুকুমার যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছি, সহসা মুষলধারে নামল বৃষ্টি। কাজেই যাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু দেখি সেই বৃষ্টির মাঝেই এন-সি-ও সাঙ্গু গাড়ি নিয়ে এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। সুকুমার আবার কার কাছে শুনেছে আজ নাকি দুর্গাপূজা শুরু। বাঙলা ছাড়ার পর দুর্গাপূজার কোনা খোঁজই রাখি নি। যাই হোক বাজার থেকে কিছু চকলেট প্রভৃতি কিনে দুপুরবেলা সেখানে উপস্থিত হলাম। দুপুরে পরম উপাদেয়ভাবে সেখানেই খাওয়া শেষ করলাম। চারটের সময় আবার গাড়ি আসবে নিয়ে যাবার জন্য। কিছু বাঙলা বই যোগাড় করলাম। বাঙলা থেকে বহুদূরে থেকেও আজ মা-বোনের স্নেহ উপভোগ করলাম। মেয়ে লক্ষ্মী ইংরেজী খুব ভালোই জানে, তবে বাঙলা বেশী জানে না—কাজেই পড়বার জন্য যখন বাঙলা বই চাইলাম সে তখন 'গীতা থেকে আরম্ভ করে নীতিসুধা পর্য্যন্ত এনে হাজির করলে। তা দেখে আমরা হাসি চাপতে পারলাম না। ডাঃ মিত্রের মতো অমায়িক ভদ্রলোক খুব কমই দেখা যায়।

আবার সুবিধা মতো আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় চাইলাম, কারণ ইতিমধ্যে সাঙ্গু গাড়ি নিয়ে এসে বাইরে থেকে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে।

এখানে দিন একেবারে মন্দ কাটছিল না। বাঙলা বইগুলি কয়েকবার শেষ করলাম। এক ভদ্রলোক পাঞ্জাবী তিনি বর্তমানে এখানে সেনিটারী অফিসারের কাজ করেন, মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতেন। তাঁর কাছে শুনলাম, জাপানীরা যখন এগিয়ে আসছিলো তখন সকলেই এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গলে পালিয়ে যান। সেই জঙ্গলে যখন প্রথম জাপানীরা আসে তখন তারা এদের অনেক কিছু খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। একটি বাড়ি থেকে তারা যখন সব কিছু খাদ্য নিয়ে যেতে চায়, এমন কি এক শিশুপুত্রের বিস্কুট পর্যন্ত, তখন সেই শিশুর মা নিজে জাপানীদের সামনে এসে শিশুটিকে দেখিয়ে নিজ ভাষায় তাকে বিস্কুটগুলি রেখে যেতে বলেন। ভাষা না বুঝলেও জাপানীটি ব্যাপারটি বুঝতে পারে ও বিস্কুটগুলি রেখে যায়। অগ্রগামী জাপানীদের সম্বন্ধে নানারকম অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায় বিশেষত চীনাদের উপর। শুনেছি এক জহোর বারু শহরেই তারা কম করে তু'হাজার চীনাকে কেটে ফেলেছে যুদ্ধের পরে। জাপানীরা এইসব চীনাকে 'কম্যুনিস্ট' বলে। প্রকৃত-পক্ষে জাপানীবিরোধী চীনা মাত্রেই কম্যুনিস্ট নামে আখ্যাত। জাপানীদের অনেকের কাছেই তলোয়ার আছে—আর এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে বিভীষিকা, কারণ তারা মানুষ কাটে এই তলোয়ারে

দিয়ে। জাপানীদের এইসব ব্যবহারে অনেকেই তাদের বিশেষ পছন্দ করতো না, তবে ভয়ে ভক্তি করতে হোত। এখানে এক প্রকার ভালোই ছিলাম কাজেই মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবতাম যদি সারা বন্দীজীবনটা এখানেই কাটাতে হয় তো একেবারে মন্দ নয়। এখানে তবু আছে অনেকটা সুখ সুবিধা—অনেকটা শান্তি।

প্রথম একবার ডাঃ মিত্রের কাছে যাওয়ার প্রায় দিন দশেক পর, আবার একবার যাওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন আমাথানির কাছে কাছে অনুমতি চাইলাম, কিন্তু এবার উত্তর হলো: Many many go no good. অর্থাৎ ঘন ঘন যাওয়া ভালো নয়। কাজেই আর তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

এখানে অন্য যে ক'জন অফিসার ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবী হিন্দু, একজন শিখ, একজন আসামের খাসিয়া পাহাড়ের, একজন মধ্যপ্রদেশের ও আমি বাঙলার। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক। এদের মধ্যে ইন্দর সিং বেশ লেখাপড়া জানেন, তাই তার সঙ্গেই আলাপ বেশী জমে ওঠে। সন্ধ্যার পর অনেক সময় বসে বসে নিজেদের ঘরের কথা আলোচনা করতাম। এমনি ভাবে আর কতোদিন কাটবে?

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে যে খবর পড়তাম তাতে থাকতো সর্বত্রই বৃটিশের পরাজয়। জাপানীরা মালয় জয় করার সঙ্গে সঙ্গেই বর্মা থেকেও বৃটিশকে বহু পিছনে সরিয়ে

দিয়েছে। ওদিকে জার্মান বেশ জোরের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। কাজেই কতোদিনে যে যুদ্ধের শেষ হবে আর কতোদিনে যে আমার বন্দীত্ব ঘুচবে তা আমরা ধারণাও করতে পারি না। হয়তো বছরের পর বছর এমনি হতাশার মধ্যেই আমাদের জীবন কাটবে সুদূর প্রবাসে। চিঠিপত্র লেখারও উপায় নেই। নীরবে অশ্রু মোচন ছাড়া আর কি আছে। ঐ তো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলতে খেলতে চলেছে আমাদের বাংলোর সামনে দিয়ে। ওদের এই হাস্যমুখর মুখ দেখে বারি বারই মনে পড়ে যায় বাঙলা দেশের এমনি ছেলেমেয়েদের।

এমনিভাবে এখানে প্রায় দু'মাস কাটানোর পর ক্যাপ্টেন আমাথানির দল এখান থেকে সদলবলে বদলী হয়ে গেলো। তার বদলে যে এলো, তার ভীষণ চেহারা দেখেই অমরা কতকটা আতঙ্কগ্রস্ত হলাম। এই অফিসারটি মোটেই ইংরেজী জানে না, তার উপর ইতিপূর্বে ভারতীয় বন্দীদের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় আমাদের খুব বেশি বিশ্বাস করতে পারে না। আমাদের বাংলোর বাইরে রাইফেলধারী জাপানী গার্ড চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে লাগলো। অবস্থা খুব খারাপ বোধ হতে লাগলো। আমাদের বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হোল! এতটা কড়াকড়ির মধ্যে এ পর্যন্ত থাকতে হয় নি, কাজেই বেশ অসুবিধা বোধ করতে লাগলাম। তারপর সে ইংরেজী মোটেই জানে না কাজেই ভাষার অভাবে শুধু মাত্র ইঙ্গিতে সব কাজ চালানো অসম্ভব হোল! অবশ্য খাওয়া বা থাকার কোনও

পরিবর্ত্তন হয় নি সেটা আগের মতনই চলতে লাগলো! এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ হুকুম হলো যে আমাদের আবার সলিতার ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে। ভেবেছিলাম এখানে দিন বেশ কাটছে, আরও কিছুদিন থাকতে পারলে ভালোই হতো, কিন্তু হুকুম মানতেই হবে। নবেম্বরে শেষাশেষি আবার সলিতা ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলাম।

আবার সলিতা—এখানকার ক্যাম্পের পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দেখলাম যে রবার গাছগুলি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। জ্বালানি কাঠের অভাবে এখানে রবার গাছগুলি ব্যবহার করা হতো। এর গুণ হচ্ছে যে কাঁচা কাঠও খুব ভালো জ্বলে। যুদ্ধের আগে রবার গাছ থেকে যথেষ্ট আয় হতো। কিন্তু বর্তমানে সব বাগানে কাজ শুরু করা প্রায় অসম্ভব, তাই অনেক জায়গার ছোট ছোট বাগান কেটে গাছগুলি জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যেও ডাঃ দত্ত বদলী হয়ে গেছে, এখানে আছে শুধু ডাঃ রে। অনেকে আই-এন-এ'তে যোগদান করেছে—তার মধ্যে ডাঃ যোশী একজন। এবার আমি ও রে একসঙ্গেই থাকতাম। এখান থেকে মাঝে মাঝে বাইরে পার্টি যেতো কাজেই ভয় হোত, কখন আবার হুকুম হবে. এখানে আর একটা পরিবর্তন বেশ লক্ষ্য করলাম, সেটা হচ্ছে ছারপোকার অত্যাচার। ব্যারাকের মধ্যে কাঠের পাটাতনে আমাদের শয়নের বন্দোবস্ত! কোন ব্যারাক একতালা, কোনটাতে আবার

গাড়ীর বাঙ্কের মতো উপরেও পাটাতন। এগুলি ছারপোকা এমনভাবে আক্রমণ করেছে যে কার সাধ্য যে সেখানে থাকতে পারে! বিছানা রৌদ্রে দিতাম কিন্তু আসল দুর্গে আমরা আক্রমণ করতে পারতাম না। বহু পরামর্শেও কি করে তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে তার কোনও উপায় আমরা পেলাম না। বৃষ্টি না হলে আমরা বাইরের মাঠেই বিছানা নিয়ে যেতাম।

এখানে পৌঁছানর কয়েকদিন পরেই শুনলাম যে, দু'শো পঞ্চাশ জনের একটি দল সিঙ্গাপুরের বাইরে যাবে। তাতে তারা এমন লোক চেয়েছে যারা পূর্বে জাপানীদের সঙ্গে কাজ করেছে। অফিসার চেয়েছে পাঁচজন। আমাদের যে দল জহোরবারু থেকে ফেরত এসেছে তার মধ্য থেকে দু'শো পঞ্চাশ জন ছাঁটাই হলো। আমার নামও এই দলে ছিলো। অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে রইলো ইন্দর সিং, পাল সিং, ডাইক ও পাণ্ডে। একদিন দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে জাপানীরা লরী নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। আমরা তাদের সঙ্গে 'টমসন' রোডে পুলিস ট্রেনিং স্কুলে এসে পৌঁছলাম। এবার বুঝতে পারলাম এরা আমাদের কাছ থেকে পুলিসের কাজ নিতে চায়। এখানে একটি লম্বা ব্যারাকের ছোট ছোট ঘরে আমাদের থাকবার জায়গা হলো। একটি ছোট ঘরে আমরা পাঁচ জন এক সঙ্গে বিছানা পাতলাম। ঘর একেবারে ভর্তি।

এখানে বেশ কড়াকড়ির মধ্যে ট্রেনিং শুরু হলো। ভোর

ছ'টায় 'কিসোৎ' রবের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠা, আবার রাত্ত দশটায় 'সোতোর' সঙ্গে শুয়ে পড়া। সারাদিন কাজে ব্যস্ত রাখতো। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাকে ডাক্তারির কায করতে হবে, কিন্তু এখানকার জাপানী অফিসার বললে, তোমাকে একটি কোম্পানীর ভার নিতে হবে, তাছাড়া অতিরিক্তরূপে তুমি ডাক্তারের কাজ করবে। আমি প্রথমে অসম্মত হই কারণ, আমি ডাক্তার, আমার দ্বারা কম্যাণ্ড করা অসম্ভব। কিন্তু তারা বললে, "তোমাকে এই কাজ করতেই হবে, নচেৎ ফল খারাপ দাঁড়াবে।" আমি 'রেড ক্রস' ও 'জেনেভা কনভেনশনের দোহাই পাড়ি, কিন্তু তাও তারা মানতে রাজি হয় না। তখন অন্যান্য অফিসারেরা আমাকে বুঝিয়ে বলে যে, এদের সঙ্গে ঝগড়া করে বিশেষ লাভ নেই। পুলিসের কাজ তুমি অনায়াসে করতে পারবে, ডাক্তারি তো সারা জীবনের জন্যই রইলো। কাজেই ব্যাপার আরও জটিল না করে আমি একটি কোম্পানীর কম্যাণ্ডার হ'তে রাজি হলাম। কিন্তু প্যারেড প্রভৃতি যা জানি, তাতে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া ততটা সুবিধা নয়। কাজেই প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধায় পড়তে হতো। তারপর আবার জাপানীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় প্যারেড শেখাতে শুরু করলো।

এখানে থাকার জায়গা যেমন কম, খাওয়ার বন্দোবস্তও তেমনি খুবই খারাপ। চাউল অবশ্য পুরোপুরিই পেতাম, আর সঙ্গে বাঁধাধরা নিয়মমতো—পাকা কুমড়ো। সবজী বলতে

শুধু আমরা কুমড়োই বুঝতাম। তা' ছাড়াও মাঝে মাঝে পেতাম অঙ্কুরিত মুগ। তরকারির জন্য যে কাঠ দেওয়া হতো, তা এতো কম ছিলো যে তা' দিয়ে রান্না মোটেই সম্ভবপর ছিলো না। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি; কারণ জাপানীরা তাঁদের নিজেদের নজির দেখাতো। কাজেই আমাদের একটু অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে হতো। রাতের অন্ধকারে আশপাশের যেখানে কাঠকুটো যতো কিছু পেতাম, সব গোপনে জড় করতাম। এমনকি, এইভাবে ভাঙ্গা গোলপোষ্টগুলিরও আমরা সদ্ব্যবহার করেছি। কিন্তু তাতেও অকুলান হতো। কাজেই মাঠে যে গোটা কতক বড় বড় গাছ ছিলো, তার ডালগুলি কাটা শুরু হলো; কিন্তু একদিন আমাদের দু'জন সিপাহী ডালকাটার সময় একজন জাপানীর নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'চারটা চড় চাপড় সহ্য করতে হলো। শুধু তাই নয়, এর পর ডাক পড়লো সব অফিসারদের এবং তাঁদেরও কিছু গালিগালাজ সহ্য করতে হলো, তবে ভাগ্যক্রমে ভাষাটা ছিলো জাপানী, কাজেই গালি বুঝতে পারলেও গালির ভাষাটা বুঝতে পারিনি। তাদের প্রথা অনুযায়ী সিপাহীদের মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করলেই তারা অফিসারদের ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ চাইতো, বলতো তোমরা সিপাহীদের ঠিক মতো চালাতে জানোনা! আমরা গালি গালাজের ভয়ে সিপাহীদের সংযত রাখবার চেষ্টা করেও সব সময় কৃতকার্য হতে পারতাম না কাজেই প্রায়ই গালি সহ্য

করতে হোত। এখানে সারাদিনই কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। এই দলেও সুকুমার বসু ও অন্য একজন আসামের বাঙালী ছিলো; কিন্তু তাসখেলা একেবারেই ছিলো বন্ধ। সারাদিন প্যারেড ও লেক্‌চার। এক লেক্‌চার প্রায় তিনবার হতো। জাপানী অফিসার বলতো জাপানীতে, তার তর্জমা করে দিতো অন্য জাপানী ইংরেজিতে আর ইন্দর সিং আবার তার তর্জমা করতো হিন্দুস্থানীতে। এখানে যে পাঁচজন জাপানী ছিলো তারা প্রত্যেকেই সিভিলিয়ান অফিসার, তাদের উপর ছিলো একজন মিলিটারী, ক্যাপ্টেন থাকাদা। ক্যাপ্টেন থাকাদা ইংরেজি বেশ ভালোই জানে, তবে বলে না; কারণ এটি হচ্ছে নাকি শত্রুদের ভাষা। কিছুদিন এমনিভাবে প্যারেড করার পর আমাদের দলটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হলো। একটি হেডকোয়ার্টার —তাতে রইলো আমাদের ডাইক ও অন্য বিশজন সিপাহি ও এন-সি-ও; একটি দলে আমি ও উনপঞ্চাশজন সিপাহি। এদের লেক্‌চার থেকে বুঝতে পারলাম যে আমাদের নাম হবে 'কোকিও কেসত সুটাই' অর্থাৎ সীমান্ত পুলিস বাহিনী। আমাদের কাজ হবে মালয় ও শ্যাম দেশের সীমান্ত রক্ষা, অর্থাৎ নিষিদ্ধ জিনিসপত্র যেন এ-পথে যাতায়াত না করতে পারে ও বিনা পাশপোর্টে যেন কোনও লোক এক দেশ থেকে অন্য দেশে না যেতে পারে। কাজেই বুঝতে পারলাম দায়িত্বপূর্ণ হলেও কাজটি আমাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়।

আমাদের বাইরে যাওয়ার হুকুম ছিল না। কাজেই

বাইরের কোনও খবর পেতাম না। তবু ডিসেম্বরের শেষাশেষি আই, এন, এ, ও জাপানীদের মধ্যে একটি গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, জেনারেল মোহন সিংকে জাপানীরা বন্দী করেছে, এই খবর শুনলাম। আমাদের ট্রেনিংও প্রায় শেষ হয়ে'এসেছে। এখন আমরা জাপানী ভাষায় হুকুম দিতে পারি এবং ওরা হুকুম দিলে সব কিছু বুঝতে পারি। শুনলাম খুব শীঘ্রই আমাদের এখান থেকে বাইরে যেতে হবে। তবে কারা কোন্ দিকে যাবে, তার এখনও ঠিক হয় নি। খুব শীঘ্রই জানানো হবে। আমরা নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা করতাম যে, জীবন কি রকম হবে। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা যখন পুলিশের কাজ ক'রব, তখন নিশ্চয়ই আমরা অনেকটা স্বাধীনতা পাবো আমাদের চলাফেরার বিষয়ে। কাজেই ক্যাম্পের মধ্যে একেবারে বন্দিজীবন যাপন করার চাইতে এ অনেক ভালো।

জানুয়ারীর প্রথম দিকেই আমাদের সব দল তৈরী হয়ে গেলো এবং কোন্ দল কোন্ দিকে যাবে, তা-ও ঠিক হয়ে গেলো। আমাদের পুরো বাহিনীটির হেডকোয়ার্টার হবে কেডা রাজ্যের রাজধানী এলোর স্টারে। সেখানে থাকবে কাপ্তেন থাকাদা ও আমাদের ডাইক। জিত্রাতে একদল যাবে, তাদের অফিসার হবেন চন্দ্রদীপ পাণ্ডে। কোলা নারাঙে থাকবো আমি ও জাপানী অফিসার ও'হারা। ক্রোতে থাকবে ইন্দর সিংএর দল। আর পাসিরপুটেতে থাকবে পাল সিংএর দল। দল ভাগ করলে

জাপানীরা। সুকুমার পড়ে গেল ইন্দর সিংএর দলে, যদিও তাকে আমার দলে পাওয়ার জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম।

এখানে আমাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর একদিন বিকালে আমরা শহরে বেড়াতে যাওয়ার ছুটি পাই। সিপাহীদের ছয় টাকা ও আমাদের দশ টাকা হিসাবে হাত খরচ দেওয়া হয়। আমাদের কোনও জিনিষ কেনার দরকার ছিল না, কাজেই কাফেতে বসে চা-পান করে সময় কাটালাম। পথে অসংখ্য জাপানী সৈন্যের ভিড়। অন্যান্য বন্দিশিবির থেকেও কিছু কিছু লোক শহরে বেড়াতে এসেছে। তাদের মধ্যে দু'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেও দেখা হোলো। তাদের মুখেও শুনলাম, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানীদের মধ্যে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। জাপানীরা নাকি কাপ্তেন মোহন সিংকে বন্দী করেছে। কাজেই যারা আই, এন, এ'তে যোগদান করেছিলো, তাদের মধ্য থেকেও অনেকে আবার বন্দিশিবিরে ফিরে এসেছে। বর্তমানে বন্দি-শিবিরে পূর্বের চাইতে কিছু উন্নতি হয়েছে। সেখানেও সকলে হাত খরচ বাবদ কিছু কিছু টাকা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে তরকারীর জন্য টাটকা সবজী ও শুকনো মাছও জাপানীরা দিচ্ছে।

শহরের আবহাওয়াতেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর সিভিলিয়ানরা জাপানীদের খুব বেশী ভয় করে না এবং জাপানী সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খলতাও অনেক কমে গেছে। আমরা সন্ধ্যার আগেই শহর থেকে আমাদের বর্তমান আস্তানাতে ফিরে এলাম। খুব শীঘ্রই আমাদের এখান থেকে যেতে হবে। প্রতি

দলে কাজে সুবিধার জন্য প্রায় কুড়িটি সাইকেল, একটি লরী ও জাপানীদের ব্যবহারের জন্য একটি মোটরকার। অন্যান্য সব জিনিস-পত্র "প্যাক" করা হয়েছে, আমরাও হুকুমের অপেক্ষায় আছি। জানুয়ারীর প্রথমে একদিন সন্ধ্যায় আমার দলকে প্রস্তুত থাকার জন্য হুকুম দেওয়া হোলো,—কালই আমাদের যেতে হবে।

পরদিন সকাল থেকেই আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সন্ধ্যায় আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের জন্য মালগাড়ির কয়েকখানা 'ভ্যান' প্রস্তুত ছিলো। আমরা আগে আমাদের মালপত্র, মোটরলরী, সাইকেল—সব কিছু ভর্তি করলাম। তারপর আমাদের পঁচিশজন পিছু একটি করে মালগাড়ির 'ভ্যান'। তাতে কোনওরকমে বহুকষ্টে বসে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু গা ছড়াবার জায়গা মোটেই নেই। বলা বাহুল্য, জাপানীদের জন্যও ঐ একই ব্যবস্থা।

আবার চলেছি নূতন স্থানে। বন্দী যখন হয়েছি, তখন হুকুম তো মানতেই হবে। আমাদের সামনেও একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, তাতে বহু অস্ট্রেলিয়ান বন্দী ছিলো। প্রত্যেক 'ভ্যানের' সামনে একজন করে জাপানী সৈনিক রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ কতটা পরিবর্তন। দীর্ঘদেহ অষ্ট্রেলিয়ানদিগকে পাহারা দিচ্ছে পাঁচ ফুটেরও ছোট জাপানীরা, আর বন্দীরা নিতান্ত ভালমানুষের মতোই চুপচাপ বসে আছে।

জাপানী বন্দী শিবিরে

রাত প্রায় দশটায় আমাদের গাড়ি সিঙ্গাপুর স্টেসন ছাড়লো। আমরা অন্ধকার 'ভ্যানের' মধ্যে বসে বসে আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। ঘুমের চেষ্টা করা বৃথা। তবুও মাঝে মাঝে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসতে লাগলো। দু'টি রাত ও একটি দিন চলার পর সকাল প্রায় দশটায় আমরা কেডা রাজ্যের রাজধানী এলোর স্টারে এসে পৌছলাম। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানোর পর আমরা সেখানে দু'জন প্রহরী রেখে শহরের একটি হিন্দুস্থানী হোটেলে এসে ভাত ও তরকারী খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করলাম।

আমাদের জন্য কয়েকটি লরী প্রস্তুত ছিলো। খাওয়ার শেষে তাতেই উঠে বসলাম। সোজা পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে আমাদের লরীগুলি ছুটে চললো। মাঝে মাঝে কয়েকটি বাজারের পাশ দিয়ে আমাদের লরীগুলি চলতে লাগলো। সামরিক পোযাকপরিহিত এতগুলি ভারতীয়কে একসঙ্গে যেতে দেখে রাস্তার দুই পাশের দোকানের বহু কৌতুহলি চীনা ও মালয়ী নরনারীও জমা হয়ে মজা দেখতে লাগলো। বেলা প্রায় দু'টোর সময় এলোরস্টার থেকে একুশ মাইল দূরে 'কৌলা নারাও, নামে ছোট্ট একটি শহরে আমরা উপস্থিত হলাম।

কৌলা নারাওে ছোট্ট নদীর প্রায় পাশেই একটি বাঙলোর মতো বাড়িতে আমাদের থাকবার জায়গা হোলো। অল্প দূরে একটি মস্ত বড় বাঙলোতে জাপানী অফিসার ও অন্য একজন জাপানী দোভাষী আস্তানা গাড়লো। আমার সমস্ত সিপাহীদের

থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্তের পর একটু বিশ্রামের অবসর পেলাম। ইতিমধ্যেই কয়েকটি কৌতুহলী শিশু আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কয়েকটি ছোট ছোট চীনা ছেলে ডিম ও কলা নিয়ে এসে বিক্রি শুরু করলো। আমরা সিঙ্গাপুর থেকে সবে-মাত্র এসেছি, কাজেই সব জিনিসই সেখানকার তুলনায় সস্তা দেখে কিনতে শুরু করলাম। সিঙ্গাপুরে ডিম একটি দশ পয়সা—এখানে মাত্র দু'পয়সা। সিঙ্গাপুরে চার পয়সায় একটি কলা, এখানে পয়সায় চার পাঁচটি কলা। পথে রেলে আসতে যথেষ্ট কষ্টভোগ করতে হয়েছে, কাজেই বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। রাতে খাওয়ার পর প্রহরী প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে আমরা আরামে শুয়ে পড়লাম। শোওয়ার পরই গভীর নিদ্রা।

সকালে উঠেই প্রথমে জাপানী কায়দায় আমাদের 'রোল-কল' হোলো। জাপানী অফিসার সকালেই হাজির হয়েছিলো। তারপর জানালে, "আজ আর প্যারেড প্রভৃতি কিছুই হবে না, তোমরা বিশ্রাম করো।" তবে এলাকার বাইরে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ, সে কথাটাও জানিয়ে গেলো। কাজেই ঘর পরিষ্কার করলাম, তারপর বাঙলোর চারদিকের ময়লা পরিষ্কার করে স্থানটি পরিপূর্ণভাবে বসবাসের যোগ্য করে নিলাম। অনেকদিন এই বাঙলোটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো। এখানে আমাকে ও আমার পরের অফিসার নয়নসুখকে একটি করে পিস্তল ও সিপাহীদের একটি করে রাইফেল দেওয়া হোলো।

অবশ্য গুলী প্রভৃতি সবই জাপানীদের কাছেই রইলো। জাপানী ভাষায় আমাদের বাহিনীটির নাম হচ্ছে "কোকিও কেসৎ সু" অর্থাৎ "সীমান্ত রক্ষীদল"।

পরের দিন জাপানী অফিসার আমাকে ও নয়নসুখকে তার নিজের বাঙলোতে ডেকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি, তা জানিয়ে দিলে। দোভাষী মালয়ী ভাষা ভালোভাবে জানলেও তার ইংরেজি জ্ঞান খুবই কম। কাজেই জাপানী, মালয়ী ও ইংরাজির সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ভাষাতেই আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগলো। আমাদের দলটিকে শ্যাম রাজ্য ও মালয়ের সীমান্তে রক্ষীর কাজ করতে হবে। অর্থাৎ বিনা পাসপোর্টে যেন কেউ সীমান্ত অতিক্রম না করতে পারে বা নিষিদ্ধ কোনও জিনিষপত্রাদি চালান না দিতে পারে। এর জন্য জঙ্গলের মধ্যে যে গ্রাম আছে, এমনি আটটি গ্রামে আমাদের আটটি আড্ডা থাকবে। প্রত্যেক দলে চারজন সিপাহী ও একজন করে এন-সি-ও থাকবে। বাকী যারা থাকবে, তাদের নিয়ে একটি হেডকোয়ার্টার হবে। এই হেডকেয়োর্টার 'কৌলা নারাঙে' থাকবে।

ছোট্ট শহর এই কৌলা নারাঙ। আমাদের দেশে একে একটি বড় গ্রামই বলা চলে। সুন্দর পিচ-ঢালা রাস্তা। স্কুল, বাজার, থানা, কোর্ট, পোস্ট অফিস, ডাক্তারখানা—সব কিছুই আছে। বাজারে চীনা, মালয়ী ও হিন্দুস্থানীদের কয়েকখানা দোকান আছে। আমাদের বাঙলোর কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে

ছোট্ট একটি পাহাড়ে নদী। এই নদীর জলই আমরা ব্যবহার করতাম স্নানের জন্য। পানের জন্য কলের জলের বন্দোবস্ত ছিলো। গাড়িঘোড়ার কোনও কলরব নেই। শুধু দিনের মধ্যে কয়েকখানা বাস এলোরস্টার পর্যন্ত যাতায়াত করছে।

বৃটিশের সময়ে সারা মালয়দেশ ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে চলতি মালয়ী ভাষাও শিক্ষা করেছি। কাজেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুবিধা আমার ছিলো। এই আত্মভোলা সরল মালয়ীদের আমার খুব ভাল লাগতো। বাঙলা থেকে বহুদূরে মালয়ের এই শান্ত নীরব প্রান্তে এসে সত্যই প্রাণে অসীম আনন্দ পেলাম। যুদ্ধ-বন্দী আমরা, কতদিন যে এমনিভাবে জাপানীদের সঙ্গে কাটাতে হবে, তা একেবারেই অজানা। যুদ্ধের অবস্থা দেখে মোটেই বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কারা জয়লাভ করবে। আপাতত জাপান ও জার্মানী বেশ তেজের সঙ্গেই দেশের পর দেশ জয় করে চলেছে। কাজেই জীবনের যে ক'টি দিন বিদেশে কাটাতে হবে, সেই ক'টি দিন যদি এমনিধারা এক নীরব প্রান্তরে কাটানো যায়, তবে একেবারে মন্দ হয় না। এখানে দুঃখ জানাবার কেউ না থাকলেও নীরব প্রকৃতির মাঝে অনেক সময় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। তাই মাঝে মাঝে ছোট্ট নদীটির তীরে গিয়ে বসতাম।

কোন্ কোন্ পোস্টে কে কে যাবে, এসব ঠিক করার পর প্রায় সাতদিন বাদে আমরা সীমান্তের দিকে যাত্রা করলাম। এক

নম্বর পোস্টের পাঁচজন, দু'নম্বর পোস্টের পাঁচজন, তা'ছাড়া রক্ষীদলে আরও পাঁচজন ; জাপানী অফিসার, দোভাষী, আমি ও নয়নসুখ। এখান থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে একটি থানা। সেই পর্যন্ত আমরা লরীতে ও মোটরে গেলাম। তারপর শুরু হোলো হাঁটাপথ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। জঙ্গল খুব ঘন নয়, আশপাশে অনেকগুলি বস্তীও আছে। দশ মাইল দূরে একটি গ্রামে পৌঁছলাম সন্ধ্যার একটু আগে। আমাদের আগমন-সংবাদ আগে থেকেই গ্রামবাসীদের জানানো হয়েছিলো। কাজেই তারা আমাদের থাকা-খাওয়ার সব কিছু বন্দোবস্ত করেছিলো। কাছের একটি পাহাড়ে নদীতে প্রাণভরে স্নান করার পর আমাদের পথ চলার ক্লান্তি অনেকখানি দূর হলো। তারপর মালয়ীদের তৈরী ভাত ও তরকারী খাওয়ার পর একটি বাড়িতে আমাদের শোবার বন্দোবস্ত হলো। চাঁদিনী রাতে আমরা বারান্দায় আরামে বিছানা পাতলাম। গভীর জঙ্গল জীবনে কোনও দিন দেখি নি। কাজেই শ্বাপদসঙ্কুল এই মালয়ের জঙ্গলে ঢুকতে প্রাণে একটু ভয় হতে লাগলো, যদিও সঙ্গে হাতিয়ার ছিলো। যাত্রার সময় প্রত্যেককেই পঞ্চাশটি করে টোটা দেওয়া হয়। জাপানীরা দেশ জয় করলেও এত দূর গ্রামে এই তাদের প্রথম প্রবেশ, কাজেই প্রাণে যথেষ্ট ভয় থাকলেও বহু কৌতূহলী মালয়ী চারদিক থেকে আমাদের প্রায় ঘিরে ফেললে। তারা আশ্চর্য হয়ে জাপানীর খাওয়া-দাওয়ার পদ্ধতি ও চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

জাপানী বন্দী শিবিরে

সারারাত এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার যাত্রা করলাম হাঁটাপথে। আজকের পথ হচ্ছে মাত্র পাঁচ মাইল। পথে দুটি ছোট ছোট নদী পার হয়ে আমরা পৌঁছলাম—কাম্-পঙ পিনাং' অর্থাৎ পিনাং গ্রামে। এই গ্রামেই আমাদের এক নম্বর পোস্ট। দোভাষী এতদূর হাঁটতে সমর্থ হয় নি। কাজেই অর্ধেক পথ থেকে ফেরত গেছে। এখানেও বহু মালয়ী উপস্থিত ছিল। আমাদের লোকদের থাকার জন্য একটি ঘর তারা আগে থেকেই তৈরী করেই রেখেছে। বেশ অল্প অল্প গরম পড়েছে। কাজেই কয়েকটা ডাবের জন্য মালয়ীদের বললাম। প্রথমে তো জাপানীরা ডাবের জল খেতে রাজী হোলো না; কিন্তু পরে আমার কথামতো জল খেয়ে জানালে, ডাবের জল খুবই উপাদেয়। তারপর মালয়ীরা এখানেও আমাদের জন্য ভাত, তরকারী রান্না করলে।

জঙ্গলের প্রায় মধ্যে হলেও গ্রামটি বেশ বড়। অধিবাসী সবই মালয়ী, আর বেশীর ভাগই গরীব। গ্রামের 'পংলু' অর্থাৎ সর্দারকে আমাদের লোকদের প্রত্যহ খাওয়ার জন্য চাল, তরকারী মাছ, মাংস প্রভৃতি জোগাড় করে দিতে বলা হলো। মাসের শেষে তাদের 'বিল' হেডকোয়ার্টারে হাজির করলেই তারা তাদের প্রাপ্য টাকা পাবে। এরা জাপানীকে খুবই ভয় করে। তার উপর ভাষা না জানার জন্যও নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। আমার সিপাহীরা সকলে মালয়ী জানে না, মাত্র দু'একজন "আপা নামা ?" "মানা পিগি' অর্থাৎ "নাম কি ?" "কোথায়

যাচ্ছ ?" ইত্যাদি ধরণের মাত্র দু'একটা কথাই শিখেছে। আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম। জাপানী অফিসারটি লোক একেবারে মন্দ নয়। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কিছু গল্প করলে।

পরদিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে রান্না ও খাওয়া শেষ করে বেলা প্রায় ন'টার মধ্যেই তৈরী হলাম। আজ এখান থেকে যেতে হবে ষোল মাইল দূরে—'কামপঙ লুবাক মহাল' জঙ্গলের পথে গ্রামের কয়েকজন গাইড নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। জঙ্গল ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হ'তে শুরু করলে। বড় বড় গাছ, ভিতরে সূর্যের আলোক পর্যন্ত প্রবেশ করে না। সরু হাঁটাপথের রাস্তা, তাও মাঝে মাঝে গাছের পাতা পড়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে, পথের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। মালয়ের জঙ্গলে বড় বড় ময়াল সাপ, হাতী ও বাঘ বহু থাকলেও গ্রামবাসীরা অভয় দিলো, ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ নাই। আমাদের সঙ্গে কয়েকটি রাইফেল ছাড়াও একটি 'লুইস গান' ছিলো। কাজেই কোনও জানোয়ার থেকে ভয় পাওয়ার বিশেষ কারণ ছিলো না। কিন্তু এত সত্ত্বেও মনের কোণে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে, তা দূর করা কঠিন। ষোল মাইল পথ, তার উপর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। জঙ্গল এবং পাহাড় ভেদ করে এতোটা দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে বিশেষ-ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে চলতে চলতে সন্ধ্যার অল্প আগে আমরা আমাদের গন্তব্য গ্রামে এসে পৌছলাম।

গ্রামবাসীরা আগে থেকেই অনেকগুলি ডাব নিয়ে তৈরী ছিলো, আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। কাছেই মালয়ের বিখ্যাত নদী "সুঙ্গি মুডা"। সেই নদীর জলে স্নান করে শরীরের ক্লান্তি অনেকটা কেটে গেলো। তবে অধিক চলার জন্য পা দু'টো প্রায় অবশ হয়ে এসেছে, কাজেই খাওয়ার পরই বিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে সারা গ্রামটা একবার ঘুরে এলাম। ছোট গ্রাম, মাত্র দশ বারোটি বাড়ি। খুব কাছাকাছি আর বিশেষ কোনও পল্লী নেই। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই শ্যামরাজ্য। সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়াতে অন্যান্য দেশের মতোই এখানে মাঝে মাঝে ডাকাতি হয়ে থাকে। অবশ্য এসব নিরীহ গ্রামবাসীদের কাছে টাকাকড়ি বা গহনাপত্র কিছুই নেই; তবু সামান্য কাপড় চোপড় ও চালের জন্যই নিষ্ঠুর শ্যামদেশীয় ডাকাতরা নিরীহ মালয়ীদের হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। একে তো জঙ্গলের মধ্যে বাঘ, হস্তী ও নানা হিংস্র জন্তুর ভয়, তার উপর আবার ডাকাতের ভয়, কাজেই পাঁচজন রাইফেলধারী পাকাপাকিভাবে এখানে থাকবে শুনে গ্রামবাসীরা খুবই আনন্দিত হোলো। তাদের সর্দারকে ডেকে যখন বুঝিয়ে দিলাম যে, এদের খাওয়ার যা' খরচ হয়, আমরা মাসে মাসে দেব, তখন তারা টাকা নিতে অস্বীকার করলে। যাই হোক আমাদের দলের উদ্দেশ্য, তাদের থাকার কারণ প্রভৃতি জানিয়ে সব বিষয়ে সহ-যোগিতা করার জন্য তাদের অনুরোধ করলাম।

জাপানী বন্দী শিবিরে

এবার আমাদের এখান থেকে ফিরতে হবে। কিন্তু হাঁটাপথে না ফিরে এবার আমরা নদীপথে ফেরার বন্দোবস্ত করলাম। এখান থেকে একেবারে সোজা 'কামপং পিনাং'। অনেকগুলি বাঁশ একসঙ্গে বেঁধে বেশ বড় একটা ভেলার মতো করা হল। পরে তার উপরে ছই দিয়ে বেশ সুন্দর একটি ঘরের মতো করা হল। মালয়ী ভাষায় এর নাম 'রাকিট'! আমরা পরের দিন সকালে খাওয়া সেরে ভেলায় উঠে বসে স্রোতের মুখে ভেলা ছেড়ে দিলাম। ধীরে ধীরে স্রোতের মুখে ভেসে চলল— আমাদের 'রাকিট'।

নদীর দু'পাশে ঘন জঙ্গল। গাছের উপর অসংখ্য ছোট বড় বাঁদর কিচির মিচির করছে। আমাদের 'রাকিট' আস্তে আস্তে নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে। ভিতরে আমরা কয়েকটি প্রাণী, তীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছি। পথে কয়েকটি জায়গাতে নদীর স্রোত উপর থেকে ঝরণার মত নীচে পড়ছে, মাঝিরা একটা চীৎকার করেই হঠাৎ 'রাকিট' নীচে নামিয়ে নিয়ে এল। এইটাই হচ্ছে সারা নদীর মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক স্থান। যদি 'রাকিট' একটু বেসামাল হয়ে পড়ে, তবেই নীচেয় পাথরের সঙ্গে ভীষণ বেগে লাগবে ধাক্কা, আর 'রাকিট' একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। যাক বিপদের ভয় কেটে যাওয়াতে আমরা আবার নীরব প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চললাম। কোথাও কোথাও নদীর স্রোত খুব বেশী, কোথাও বা আশেপাশে বিরাট পাথর মাথা উঁচু করে

আছে, কোথাও বা বিরাট বৃক্ষ, নদীর পথ বন্ধ করে আছে। মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হচ্ছে। জাপানী অফিসার সেই যে মুখ গোমরা করে ভেলায় চড়েছে, তারপর তার মুখে আর কোনও কথা নেই। আশ্চর্য এই লোকটি। কখনও খুব হাসি মুখে আমাদের সঙ্গে গল্প করছে, কখনও এত গম্ভীর যে দেখলেও ভয় লাগে। মাঝিরা মাঝে মাঝে আমাদের লোকদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। এমনিভাবে প্রায় আট ঘণ্টা চলার পর আমরা পিনাঙ-এ উপস্থিত হলাম। হাঁটাপথে যেমন কষ্ট সহ্য করেছি, নদীপথে তেমনি আরামে এসে পৌঁছলাম। আজ রাতে এই গ্রামেই থাকার বন্দোবস্ত হলো। রাতে খাওয়ার পর একটি খোলা বারান্দায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করা গেল।

পরের দিন সকালে খাওয়ার পর পাঁচ মাইল পথ হাঁটলাম। তারপর যে গ্রামে উপস্থিত হলাম, সেখানে আগে থেকে আমাদের সাইকেল আনিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজেই দশ মাইল পথ, আমরা সাইকেলে রওনা হলাম, পথে যদিও সাইকেল চালানো খুব সহজ নয়। কোথাও চড়াই, আবার কোথাও দুতিন মাইল একেবারেই উৎরাই। পাহাড়ের রাস্তা। যাই হ'ক, সাবধানে সাইকেল চালিয়ে আমরা থানায় উপস্থিত হলাম। সেখানে মোটর ও লরী হাজির ছিল। আমরা আবার 'কৌলা নারাঙে' ফিরে এলাম।

এখানে দু'তিন দিন বিশ্রাম করার পর আবার তিন ও চার নম্বর পোষ্টের জন্য রওনা হলাম। এদিকেও প্রথম বার মাইল

সাইকেলের রাস্তা, তারপর একটি থানা। সেখান থেকে দশ মাইল হাঁটা পথে—তিন নম্বর পোষ্ট। আবার সেখান থেকে চার মাইল দূরে চার নম্বর পোস্ট। এত লোকের পক্ষে সাইকেলে যাওয়া সম্ভবপর নয়, তার উপর সকলেই সাইকেল চালাতেও জানে না। কাজেই হাঁটাপথেই চলতে শুরু করলাম। বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ থানায় উপস্থিত হলাম। পাশেই ছোট পাহাড়ে নদী। তাতেই স্নান করে বিশ্রাম করলাম। থানার পুলিস জাপানীর আগমনের উপলক্ষ্যে সেখানে একটু ছোটখাটো উৎসবের বন্দোবস্ত করেছে। খানিকটা গান-বাজনার পর খাওয়া শেষ করলাম। পরে শুরু হোলো 'ওয়াং কুলিট'। একটি সাদা পরদার পিছনে নানা রকম ছবির খেলা। পিছনে আলো থাকাতে ছবিগুলির ছায়া সব পর্দার উপরে পড়ে। পিছনের ছবির মুখ দিয়ে মালয়ীরা কথা বলে। বেশীর ভাগ ঘটনাই রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। মন্দ উপভোগ্য নয়। এর আগেও মালয়ে এ ছবি দেখেছি। শহরে নানা রকম আমোদ প্রমোদ থাকলেও, গ্রামে কিছুই নেই। কাজেই কম খরচায় এই ছায়া-ছবিই হচ্ছে গ্রাম অঞ্চলে একমাত্র আমোদের উপায়। রাত প্রায় একটা পর্যন্ত আমরা এই ছবি দেখলাম। তারপর ঘুম। জাপানী মালয়ী ভাষা জানে না, তবু অনেকক্ষণ ধরে তাদের ছবি উপভোগ করলে।

পরের দিন সকালে খাওয়া সেরে আবার চলতে শুরু করলাম। বাকা দশ মাইল পথ। আজকের পথে জঙ্গল

খুবই গভীর। থানার পর থেকে এই গ্রাম পর্যন্ত কোনও পল্লী নেই। আমরা আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। পথে ছোট ছোট পাহাড়, আর পাহাড়ে নদী। বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা মাঝে মাঝে পথ রোধ করছে। প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলার পর একটি পাহাড়ে নদীর তীরে পাথরের উপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। কল কল নাদে বয়ে চলেছে পাহাড়ে নদী। জল অল্প, স্রোতের বেগ ভয়ানক তীব্র। একহাঁটু জলের নদীও পার হতে ভয় লাগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করার পর আমরা আবার চলতে লাগলাম। প্রায় মাইল দুই চলার পর একটি জায়গাতে গাছের ডালপালা ভাঙ্গা দেখলাম। মালয়ী বললে্ 'গজ' অর্থাৎ হাতী। কিছুক্ষণ আগে এই পথে হাতী এসেছিল। তাদের বিরাট পদচিহ্ন দেখে সত্যিই প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। জঙ্গলের মধ্যে হাতীর পদচিহ্ন! প্রতিপদে মনে ভয় জাগে, হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় হাতীর সঙ্গে, তা হলে কি অবস্থা হবে? এখানকার মালয়ীরা বরাবর জঙ্গলে থাকে। তারা সহজেই বুঝতে পারে' জন্তু-জানোয়ার কত দূরে আছে। কাজেই বললে, এখান থেকে দূরে চলে গেছে ভয় নেই। আমরা যত আগে চলি, ততই পথের উপর দেখি হাতীর পদচিহ্ন ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে গেছে। কয়েকদিন আগে অল্প বৃষ্টি হওয়াতে মাটি অল্প নরম ছিল। কাজেই অল্প অল্প জোঁকের অত্যাচারও আমাদের সহ্য করতে হচ্ছিল। রাক্ষুসে দেশ আফ্রিকার কাহিনী ছেলেবেলাতে পড়েছি, সেই ধারণা মনে

বদ্ধমূল। কাজেই প্রতিমুহূর্তেই ভাবছিলাম, হয়ত হঠাৎ সামনেই এসে পড়বে কোন হিংস্র জানোয়ার। এইভাবে আরও প্রায় দুই মাইল চলার পর সেই পদচিহ্ন আর দেখতে পেলাম না। বিকালে এই দশ মাইল পথ হেঁটে আমরা উপস্থিত হলাম 'কামপং কৌলা'। নামে গ্রাম হলেও আশ পাশে মোটেই বাড়ি ঘরের চিহ্ন দেখলাম না। একটি খড়ের বাড়ি, আগে থানা ছিল' বর্তমানে একেবারেই খালি। সেখানেই আমাদের তিন নম্বর পোস্ট হল। শুনলাম, আগে এখানে একটি বড় গ্রাম ছিল, কিন্তু হাতী ও বাঘের উপদ্রবে গ্রামবাসীরা নানা দিকে উঠে গিয়েছে। এখান থেকে জঙ্গলের হাঁটাপথে শ্যামরাজ্য আট মাইল। অন্য আর একটি পথে মাত্র দু'মাই ল। আগে এখানে একটি থানা ছিল, কিন্তু জঙ্গলের থানার পুলিস প্রায়ই বাইরে বাইরে পালিয়ে থাকত। কাজেই থানা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সুবিধার মধ্যে একটি তৈরী বাড়ি ও টেলিফোন পাওয়া গেল। বাড়িটির চারদিকে মাত্র হাত দশেক জায়গা বেশ পরিষ্কার, তার পরেই জঙ্গল। সন্ধ্যার পর খাওয়া সেরে আমরা গল্প শুরু করলাম। আজ জাপানীটি বার বার হাতীর কথাই জিজ্ঞাসা করছিল। পায়ের দাগের অনুপাতে হাতীটি কত বড় হতে পারে, এইটিই ছিল তার গবেষণার বিষয়। রাতে শোওয়ার পরও আমরা মাঝে মাঝে নানা জানোয়ারের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, যার মধ্যে শুধু হাতীর আওয়াজ চিনতে পারলাম। পরদিন সকালে উঠেই চার নম্বর পোস্টের জন্য

তৈরী হলাম। প্রথমেই পার হলাম ছোট্ট একটি নদী। তার-পরই আবার ঘন জঙ্গল। খানিক দূর যাওয়ার পরই আবার সেই হাতীর পদচিহ্ন। মনে হ'ল হাতীটি কৌলার পাশ দিয়ে এই পথেই আবার এগিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যে সিপাহীরা ছিল, তারাও জীবনে এমন জঙ্গল ও কোনও জন্তু জানোয়ার দেখে নি। কাজেই হঠাৎ সামনে কিছু উপস্থিত হলে ব্যাপার যে কতদূর গড়াবে, তা বেশ অনুভব করা গেল। পথে একটি ছোট পাহাড়ে নদী। অসংখ্য ছোট বড় পাথরে ভর্তি। তাই হেঁটে পার হতে হবে। স্রোতের ভীষণ টান, তার উপরে পাথরগুলি সবই পিচ্ছিল। একবার পা ফসকালে পাথরে শরীর একবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে নদীটি পার হলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টায় আমরা পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্য স্থল, 'কামপং মন গজ উলু'। ছোট্ট গ্রাম, সব শুদ্ধ মাত্র বারখানা বাড়ি। আবালবৃদ্ধ বণিতা নিয়ে লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশজন। এইটিই মালয়ের শেষ গ্রাম। এর পর মাত্র দু'মাইল দূরেই হচ্ছে শ্যাম রাজ্য। আমরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার রওনা হইলাম সীমান্ত দেখার জন্য। সীমান্তের সীমানা নির্দেশক পাথর দেখে আমরা ফিরে এলাস। পাঁচজন সিপাহীর এখানে থাকার বন্দোবস্ত করে সেই দিনই বিকেল বেলা আমরা ফিরে এলাম কামপং কৌলা। সে রাতটা সেখানেই বিশ্রাম করে পরদিন সকালে আবার ফিরে এলাম সেই থানা পর্য্যন্ত। সেখান থেকে আগের মত সাইকেল নিয়ে আবার ফিরে এলাম কৌলা নারাঙ।

কয়েক দিন অনবরত পথ চলাতে সকলেই ক্লান্ত, বিশেষ করে জাপানী অফিসার নিজে। কাজেই এবার দিন চারেক কোলা নারাঙে বিশ্রাম করার পর রওনা হবো ঠিক হোলো।

এবার এখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের সঙ্গে আলাপ হল। মালয়ী ভদ্রলোক, বয়স বোধ হয় ত্রিশ বত্রিশের কাছাকাছি, কেডার সুলতানের নিকট আত্মীয়। ইউরোপের অনেকগুলি দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হলো। তিনি জাপানীদের বিশেষ ভয় করতেন, এমন কি বলতেন যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নেও জাপানীদের চেহারা দেখে চমকে উঠেন। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বিদ্বেষও মেশানো ছিল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনা। তখন সবে জাপানীরা এই এলাকা অধিকার করেছে। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার জাপানীদের সঙ্গে দেখা করে তখনও নিজের কাজ করছিলেন। জাপানী অফিসার তাঁকে একটি লিখিত পত্র দেন, তা'তে জাপানী ভাষায় লেখা ছিল,—ইনি এখানকার জেলার অফিসার, কাজেই কোন জাপানী যেন তাঁর কোনও কাজে বাধা না দেয় এবং যেন তাঁকে অফিসারজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করে। একদিন সকালে একটি ছোট মোটরে দু'জন জাপানী এসে উপস্থিত। তারা জাপানী ভাষায় তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। তিনি বুঝতে অক্ষম হলে তারা রাগান্বিত হয়ে পড়ে এবং পিস্তল খুলে তাতে গুলি ভর্তি করতে শুরু করে। তারপর তাঁকে কাছে আসতে ইশারা করে। তিনি বিশেষ ভাবে ভীত হয়ে পড়েন।

তখন তাঁর মনে পড়ে হয়ত এরা আমাকে মেরেও ফেলতে পারে, তার চেয়ে এদের কাছে সেই জাপানী ভাষায় লেখা পরিচয় পত্রটা নিয়ে এসে দেখাই, তারপর যা' হয় হবে। লেখাটা দোতালায় ছিল। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে উপরে উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন জাপানী তার তলোয়ার খুলে একেবারে পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। তিনি লেখাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বুকের উপর তুলে ধরেন। তখন তারা সেটা পড়েই তলোয়ার খাপের মধ্যে পূরে ফেলে হাসতে হাসতে তাঁকে ইশারায় জিত্রার পথ জিজ্ঞাসা করে। তারপর নীচে নেমে একেবারে মোটরে চড়ে উধাও। তিনি এত ভীত হয়ে পড়েন যে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পাশের বাংলোতে তখন কয়েকজন হিন্দুস্থানী সিপাহী ছিল। তারা এসে তাঁকে শুশ্রূষা করে জ্ঞান সঞ্চার করে। তারপর থেকে তিনি জাপানী দেখলেই বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়েন। তিনি যখন আমাকে এই ঘটনার কথা বলেন, তখনও তাঁর চোখ-মুখের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এখন অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হলেও তিনি সেই বিভীষিকাময় ঘটনার কথা মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেন নি। জাপানীদের আরও একটি মজার কাহিনী তিনি আমাকে শোনান। প্রথমে জাপানীরা যখন এদেশে আসে, তারা ডাব খেতে জানতো না। কিন্তু সাধারণত মালয়ীরা তাদের ডাবের জল খেতে দিতো, তারাও ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই জাপানী সিপাহীরা গ্রামে এলেই প্রথমে ডাবের জল খেতে চাইতো। মাঝে মাঝে তারা নিজেরাই ডাব

পেড়ে জল খেতো। একদিন কয়েকজন জাপানী সিপাহী কাছা-কাছি একটি গ্রামে আসে, তাদের মধ্যে কেহই গাছে চড়তে জানতো না। কাজেই তারা একজন গ্রামবাসীকে গাছে চড়ে ডাব পেড়ে দিতে বলে। যাকে তারা গাছে চড়তে বলে তিনি একজন স্কুল মাষ্টার এবং গাছে তিনি জীবনে চড়েন নি। তবু জাপানীরা তাকে জোর জবরদস্তি করে গাছে চড়ায়। তিনি বহুকষ্টে মাত্র পাঁচ ছয় হাত উপরে উঠতে সক্ষম হন। বহু চেষ্টাতেও তার চেয়ে উপরে উঠতে পারেন না। তিনি নেমে আসার চেষ্টা করাতে জাপানীরা তাদের সঙ্গীন খুলে গাছের দিকে উঁচু করে রাখে। তখন মাষ্টার বেচারীর অবস্থা রাইফেলের সঙ্গীনের চাইতেও সঙ্গীন। না পারেন তিনি উপরে উঠতে, না পারেন নীচে নামতে। মধ্যপথে প্রাণপণে গাছ আঁকড়ে তিনি সহ্য করতে লাগলেন অসংখ্য পিপীলিকার কামড়। করুণ অথচ হাস্য-রসাত্মক দৃশ্য। একটি বছর বারোর ছেলে গুরুর এই অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে এবং পাশের একটি গাছে চড়ে জাপানীদের ডাব পেড়ে দেয়। তখন মাস্টার বেচারা নীচে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। অনেক জায়গাতে জাপানীরা করাত দিয়ে নারিকেল গাছ কেটে ফেলে ডাব খেয়েছে। প্রথম প্রথম এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। কারণ একের পক্ষে অপরের ভাষা একেবারেই অবোধ্য। নারকেল গাছের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে অনেক জাপানী স্থপারী গাছও কেটে ফল পেড়েছে। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে স্থপারী, নারকেল গোষ্ঠীর কেউই

নয়।—এই সামান্য সামান্য ঘটনার মধ্যে প্রথম প্রথম জাপানীরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করত, তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বাংলোর পাশেই ছ'নম্বর ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের বাংলো। সেখান থেকে মাঝে মাঝে গ্রামোফোনের সুমধুর সঙ্গীতের স্বর ভেসে আসতো। হিন্দুস্থানী গানের রেকর্ড "ম্যায় বন্‌কে চিড়িয়া বন্‌কে বন বন বলু রে—" ভারতের বাইরে বহু জায়গাতে শুনেছি। এখানেও হিন্দুস্থানী গান বলতে এই রেকর্ডখানা বোঝায়। এই রকম মালয়ের সর্বজন প্রিয় গান হচ্ছে—

"—বুলাং তেরাং বুলান তেরাং বিনতাং বারছায়া,
বুরং গাগা মে মাথন প্যাডি,
কালু তুয়ান তিয়াডা পারচায়া,
বুলে সায়া মেলিহাত হাতি।—"

অর্থাৎ—চাঁদের আলো, চাঁদের আলো, আকাশে তারকারা শোভা পাচ্ছে। অদূরে মাঠে কাক ধান খাচ্ছে। হে, প্রিয়তম! যদি তুমি আমাকে আজও না চিনতে পেরে থাকো তবে আমি আমার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেখাতে পারি।

প্রায় প্রত্যেক মালয়ীর বাড়ীতেই এই গানের রেকর্ডখানা আছে। এ গানটী প্রায়ই শুনতাম। তা' ছাড়াও মাঝে মাঝে আমাদের শোনাবার জন্যই ভদ্রলোক, হিন্দুস্থানী রেকর্ডের পর

রেকর্ড চালিয়ে যেতেন। নদীর তীরের উপরই এখানকার পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাম্পিং ষ্টেসন। সেখানে একজন শ্যাম-দেশীয় ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসবাস করতেন। কাজের মধ্য দিয়েই তাদের সঙ্গে আমার আলাপ এবং ক্রমে এই আলাপ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভদ্রলোক সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলতে পারতেন; স্ত্রী অবশ্য মালয়ী ভাষাতেই কথাবার্তা চালাতেন। এদের কাছে বসে বসে আমি শ্যামদেশের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতির বহু গল্প শুনতাম! এরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং রাজাকে এরা সকলেই খুব সম্মান প্রদর্শন করে।

মাত্র চারদিন সেখানে বিশ্রাম করার পর আবার সুরু হোল অন্যান্য পোষ্ট বা ঘাঁটী স্থাপনের কাজ। পাঁচ নম্বর পোষ্ট হোলো এখান থেকে হাঁটাপথে প্রায় দশ মাইল পথ! সেখানেও আমাদের পাঁচজন লোক রেখে এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আমরা যাত্রা করলাম ছয় নম্বর পোষ্টে! এই পথটী খুবই খারাপ একেবারে দুর্গম বলা চলে। বারো মাইল পথ চলতে ২৯ বার পাহাড়ে নদী পার হ'তে হয়! একটী নদী বার বার ঘুরে আসছে পথের সামনে। জল অল্প হোলেও স্রোতের টান খুবই বেশী। এতোবার পায়ের বুট পট্টি খোলা একেবারেই অসম্ভব কাজেই বুট পট্টি সমেতই আমরা বার বার নদী পার হতে লাগলাম! তার উপর ছোট ছোট অসংখ্য জোঁকের অত্যাচার। লাখে লাখে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিজে-

গাছের পাতায় পাতায়! একটু জোরে বাতাস বইলেই তারা গাছ থেকে পড়ছে গায়ের উপর। তা'ছাড়া নীচেও তাদের সংখ্যা অগণনীয়। নীচে ও উপর থেকে এদের সম্মিলীত অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম! কয়েকটী বিশেষ উৎসাহী জোঁক বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পায়ের পট্টি ও মোজা ভেদ করে একেবারে পায়ের সঙ্গে লেগে পড়েছে। তারা বেশ নির্বিবাদেই প্রাণভরে রক্তপান করলে। বহু কষ্টে বারো মাইল পথ অতিক্রম করে—সন্ধ্যার অল্প আগে আমরা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এই গ্রামের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার প্রত্যেকেই শ্যামদেশের অধিবাসী। গ্রামের প্রধানকে এরা বলে 'নায়বান।' মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট কুটীর নিয়েই গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা সর্বশুদ্ধ মাত্র ত্রিশজন। এখান থেকে শ্যামরাজ্য হচ্ছে মাত্র ছয় মাইল। আর জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা পথ হোলেও রাস্তা অনেকটা ভালো কারণ এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রায়ই শ্যামরাজ্যে যাতায়াত করে। শ্যামীরা প্রত্যেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের গ্রামের কাছাকাছি একটী আশ্রম গোছের বাড়ী আছে। এখানে থাকে কতকগুলি পীতবর্ণের পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুক। গ্রামবাসীরাই এই আশ্রমের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। শ্যামী ভাষায় এগুলিকে 'ওয়াট' বলে। গ্রামের প্রধান বেশ সুন্দর মালয়ী ভাষা বল্তে পারে, অন্যান্যরা খুব অল্পই মালয়ী ভাষা বলিতে পারে। পুরুষদের পোষাক মালয়ীদের মতোই লুঙ্গি। মেয়েরা সাধারণত লুঙ্গী ব্যবহার করে। অনেকে ধুতী মালকোঁচা মেরে

পড়ে। লজ্জা বা শালীনতার বড় বেশী কড়াকড়ি দেখলাম না। অবিবাহিতাদের তবু বুকের উপর একটা কাপড়ের আবরণ আছে, কিন্তু যারা সন্তানের জননী তাদের সেটুকু আবরণও নাই। অবশ্য এরা একেবারেই গ্রামের লোক আর শুধু গ্রাম্যই নয়, কতোকটা জঙ্গলীও বটে। কাজেই এদের আচার ব্যবহার দেখে প্রকৃত শ্যামবাসীদের সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা ভুল হবে। আমাদের সশস্ত্র প্রহরীদের দেখে এরা মোটেই ভীত হোল না। খুব কাছে এসে বিশেষ কৌতুহলের সঙ্গে আমাদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। আমাদের সিপাহীদের থাকার জন্য এরা আগে থেকেই একটী কুটীর তৈরী করে রেখেছিলো। রাতে খাওয়ার পর সেখানেই বেশ আরামে নিদ্রা দেওয়া গেল। পরের দিন আমরা আবার ফিরে এলাম 'কৌলা নারাঙ'।

মাত্র একদিন বিশ্রাম করার পরই আমরা আবার রওনা হলাম, সাত নম্বর ও আট নম্বর পোষ্টের জন্য। এবার দশ মাইল সাইকেলের রাস্তার পর একটী থানা। আমরা পিছনে সাইকেল পাঠানোর বন্দোবস্ত করে হাঁটাপথেই রওনা হলাম। প্রথম দিনে দশ মাইল পথ হেঁটে থানায় পৌছলাম।

সাত নম্বর ঘাঁটী থানা থেকে প্রায় সাত মাইল। সকাল ন'টার মধ্যে যাওয়া সেরে রওয়ানা হলাম। পথ খুব খারাপ ছিলো না—কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে পথ বড়ই পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। কোনও রকমে আছাড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে আমরা ঘাঁটীতে পৌছলাম। এই গ্রামটী একটু

বড়, প্রায় পঁচিশটী বাড়ী আছে। অধিবাসী শ্যামী ও মালয়ী। আমাদের ইচ্ছা যে আজই আট নম্বর ঘাঁটী যাই। কাজেই সিপাহীদের থাকার বন্দোবস্ত ও তাদের কার্য্য সম্বন্ধে সজাগ করে বেলা ছ'টায় আমরা সাত নম্বর ঘাঁটী থেকে আট নম্বর ঘাঁটীর জন্য রওয়ানা হলাম। যে রাস্তায় এসেছিলাম সেই রাস্তায় চার মাইল ফিরে একটী বড় গ্রাম, সেখান থেকে আবার চার মাইল পথ হচ্ছে আট নম্বর ঘাঁটী। আমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করলেও পথে খুব বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের খুব দেরী হয়ে গেলো। একটী সিপাহী চলতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করছিলো তার সঙ্গে আমি নয়নসুখ ও একজন মালয়ী পুলিশ অফিসার আস্তে আস্তে আসছিলাম। জাপানীর সঙ্গে অন্যান্যরা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। খানিক পরে আমরা চীৎকার করে ডেকেও কোন সাড়া পেলাম না। এদিকে ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। জঙ্গলে চার পাঁচ হাত আগে পর্যন্ত নজর চলে না। তখনও আমাদের ওখান থেকে গ্রাম প্রায় একমাইল দূর। আমরা বেশ ভীত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে মাত্র তিনজনের তিনটী পিস্তল। একটী টর্চলাইট পর্যন্ত নেই। পুলিশ অফিসারটী আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিলেন। আমরা প্রতি পদক্ষেপে ভাবছিলাম হঠাৎ যদি সামনে কোন জানোয়ার এসে পড়ে তা'হলে আমাদের অবস্থা কি হবে। তার উপর সাপের ভয় —এদিককার জঙ্গলে শুনেছি বহু বড় বড় ময়াল সাপ দেখা যায়।

অসুস্থ সিপাহীটী আর মোটেই চলতে পারছে না। আর মাত্র অল্প একটু রাস্তা আছে বলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। সামনেই একটী ছোট নদী। সেই অন্ধকারে পাথর দেখে চলা বড়ই কঠিন। বহু কষ্টে হাত ধরাধরি করে, নদীটী পার হলাম। বার বার মনে ভয় হচ্ছে আজ হয়তো আমাদের নিশ্চয়ই কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তা' না হলে এমন অবস্থা ঘটবে কেন? যাই হোক অল্প পরে দেখলাম অনেকগুলি লোক কয়েকটী আলো নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের দেখে আমাদের যেন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হোল! তাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা গ্রামে এসে পৌছলাম। আমাদের আসতে দেরী দেখে জাপানী অফিসার আলো নিয়ে লোক পাঠায় আমাদের সন্ধানে।

আজ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে আমরা এই গ্রামেই রাতে থাকার বন্দোবস্ত করলাম। জলে কাপড় জামা সব ভিজে গিছলো কাজেই আগুন জ্বেলে সেগুলি সেঁকে নেওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। জাপানী সঙ্গে করে "সাকে" এনেছিলো তাই বেশ খানিকটা উদরস্থ করে, আরামে শয্যা গ্রহণ করলো। জাপানীরা চিরকালই মদের খুব ভক্ত।

সারারাত বিশ্রাম করবার পর, পরদিন একেবারে সকালেই রওয়ানা হলাম আট নম্বর ঘাঁটীর দিকে। মাত্র মাইল পাঁচেক পথ কাজেই মাত্র দেড় ঘণ্টা চলার পরই আমরা পৌছলাম "কামপঙ ডুরিয়ান বুরং"। ডুরিয়ান হচ্ছে মালয়ের একটী

বিখ্যাত ফলের নাম। কাজেই এখানে খুব বেশী ডুরিয়ান গাছ দেখতে পাওয়া যাবে আশা করেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। এটী বেশ একটী বড় গ্রাম। এই গ্রামে অনেক ঘর লোকের বাস। প্রায় পঞ্চাশটী বাড়ী আছে। খাওয়ার পর আমরা ফেরার পথ ধরলাম। সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা কৌলা নারাঙ এসে পৌঁছলাম। এইভাবে দীর্ঘ পথ হাঁটার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। একদিনে বারো মাইল, ষোল মাইল পথ এই জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটা বেশ কষ্টকর। তবু উপায় নেই। জাপানীদের হুকুম তো মানতেই হবে। ফিরে আসার পর সারাদেহে বেশ ব্যথা অনুভব করছিলাম, বিশেষকরে পা'দুটীতে। যাক্ তবু এবার কয়েকদিন আরাম পাওয়া যাবে!

এখানে একটী চীনা স্কুল বাড়ীতে আমাদের অফিস। আসবাবপত্রের অভাব না থাকলেও কাজের বেশ অভাব ছিলো! যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীদের পক্ষেও দেশ বিদেশ যাতায়াত করা বিশেষ সম্ভব নয়। কাজেই অন্য দেশের ছাড়পত্র নেবার লোকের একান্ত অভাব। তবে কাজ থাক আর নাই থাক বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আফিস ঠিক নিয়মিতভাবেই খোলা থাকতো! এবার পোষ্ট থেকে ফিরে আসার পর আমরা বাংলো থেকে বাজারের নূতন ঘরে উঠে আসি! অফিসের হলঘরটিকে পার্টিসন দিয়ে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা হয়! মধ্যের অংশে অফিস, একধারে ষ্টোর ও অন্যধারে আমার ও সাব অফিসার নয়নসুখের থাকার জায়গা। বাজারের কয়েকটী

দোকান ঘরের উপরতলায় আমাদের সিপাহীদের থাকার বন্দোবস্ত। আর আগে আমরা যে বাংলোটীতে থাকতাম সেটীকে একটী ছোট হাসপাতালে পরিণত করলাম আমার রুগীদের জন্য। কিছু ঔষধ আমার কাছে ছিলো তাই দিয়েই তাদের চিকিৎসা করতাম। কঠিন রুগীদের 'এলোর ষ্টার' সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করেছিলাম। এই সব ঘাঁটীর বন্দোবস্ত করতেই আমাদের সারা জানুয়ারী মাসটা কেটে গেলো!

যুদ্ধের দরুণ মালয়ে চা'ল খুব কম পড়ে গিয়েছিলো কাজেই জাপানীদের কৃষি বিভাগ 'অধিক খাদ্য উৎপন্ন করো' নীতি কাজে লাগালো। প্রত্যেক গৃহস্বামীর উপর হুকুম হোলো যে তাদের বাড়ীতে একটুও পতিত জমি থাকবে না। প্রত্যেক জমিতে শুধু শাক সব্জী লাগাতে হবে। সাধারণ লোকদের আদর্শ দেখাবার জন্য জাপানী গভর্ণরের বাড়ীতেই প্রথম কাজ সুরু হোলো! 'লন' এবং ফুলবাগানের পরিবর্তে সমস্ত জমিতে শুধু কলাগাছ ও লাউ কুমড়া প্রভৃতির গাছ লাগানো হয়েছিলো। মালয়ীরা বছরে একবার ধান উৎপন্ন করতো। জাপানী কৃষি বিভাগের অফিসার ও সিপাহীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে বৎসরে দু'বার ধান উৎপন্ন করতে হয়! এদিকে দ্বিতীয়বার ধান উৎপাদনের কাজ শেষ হওয়াতে এই এলাকাতে জাপানীরা গ্রামবাসীদের আমোদ উৎসবের জন্য কিছু টাকা দান করে! সেই টাকায় এবং গ্রামবাসীরা মিলে আরও

কিছু টাকা তুলে এক সপ্তাহব্যাপী আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করে। কৌলা নারাঙের মাঠে এই উৎসবের আয়োজন হয়। নাচ গান, কথকতা 'ওয়াং কুলিট' প্রভৃতি সব রকম আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিলো! রোজই সন্ধ্যা থেকে প্রায় রাত হু'টো পর্যন্ত উৎসব চলতো।

'রংগিং' হচ্ছে, 'মালয়ীদের বিশেষ প্রিয় নাচ। কতকটা ইংরেজী বল-নাচের মতো হোলেও এদের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, কেউ কারো দেহ স্পর্শ করে না। পরস্পর থেকে অল্প দূরে দূরে থেকেই নাচতে হয়। গ্রামবাসীরা সকলেই এই উৎসবে মত্ত হয়ে পড়েছে। বহু দূর দূর গ্রাম থেকে নরনারীরা এখানে এসে জমা হয়েছে! থাকার জায়গার অভাব নেই! আর খাওয়ার জন্য আছে অসংখ্য 'কাফে'। 'মালয়ের লোকেরা দোকানে খাওয়া খুবই পছন্দ করে। তাই 'সহর থেকে বহু দূরের ছোট ছোট গ্রামে পর্যন্ত হোটেল ও চায়ের দোকান দেখেছি। আমার সিপাহীরাও এই উৎসবে যোগদান করতো। আমরাও 'মাঝে মাঝে নাচ প্রভৃতি দেখে ফিরে আসতাম।

ফেব্রুয়ারী 'মাসের প্রথমদিকে, হঠাৎ একদিন টেলিফোনে খবর পেলাম যে আমাদের দু'নম্বর ঘাঁটীর কাছাকাছি, একটী গ্রামে ডাকাতেরা হানা দিয়েছে। আমাদের সিপাহীরা গুলী চালাতে বাধ্য হয়েছিলো— তাতে একজন গ্রামবাসী ডাকাত মারা পড়ে। অন্যান্যেরা পালিয়ে যায়। ডাকাতটীর মৃতদেহ তারা থানা পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে আমরা তৈরী হলাম,

সেখানে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা কি জানবার জন্য। একজন অফিসার এখানে থাকা দরকার, কাজেই নয়নসুখকে রেখে, আমি, জাপানী অফিসার ও দুজন সিপাহী সাইকেল ও লরী নিয়ে যাত্রা করলাম! থানায় পৌঁছেই প্রথমে সেই মৃতদেহ দেখলাম—বিরাট চেহারা, সারা দেহে নানা রকম উল্কির দাগ। শুনেছি এদের বিশ্বাস এরকম উল্কির দাগ থাকলে তাতে নাকি কোনও রকম আঘাত লাগতে পারে না। কিন্তু এ বেচারার মাথায় একটী বুলেট লাগতেই লোকটী মারা পড়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোলো আর কেউ একে চেনে কিনা? সকলেই 'না' বললে। তখন সেই মৃতদেহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের দেওয়া হোলো অন্ত্যেষ্টির জন্য। আমরা সেই দিনই সেখান থেকে সাইকেল চড়ে দশ মাইল পথ পরের গ্রামে উপস্থিত হলাম, তারপর হাঁটা পথে উপস্থিত হলাম, এক নম্বর ঘাঁটিতে। এখানে বসে খানিকটা পরামর্শ করা হোলো। এখানে শুনলাম আমাদের দু'নম্বর ঘাঁটী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে একটী গ্রামে সন্ধ্যার আগে ডাকাতেরা হানা দেয়। গ্রামবাসীরা ডাকাতের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। দু'টী মালয়ী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমাদের ঘাঁটীতে খবর দেয়। তখন আমাদের ঘাঁটীর দু'জন সিপাহী মালয়ীদের সেই গ্রামে উপস্থিত হয়। মালয়ীরা দূর থেকে যেখানে ডাকাতেরা আছে, সেই বাড়ীটী দেখিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাওয়াতে

ডাকাতেরা সেই বাড়ীতে বসে বসে মদ খেতে সুরু করে। শুধু ঘরের বাইরে একজন বন্দুকধারী ডাকাত প্রহরীর কাজ করছিলো। আমাদের সিপাহীরা চুপি চুপি বাড়ীর কাছাকাছি এসে গুলী চালায়। প্রথম গুলিতেই প্রহরী ডাকাতটী মারা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই পালিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে। আমাদের সিপাহীরা তাদের তাড়া করে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। সিপাহীরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তিনটী গাদা বন্দুক ও কিছু ছোরা প্রভৃতি হস্তগত করে ফিরে আসে। আমরা আশা করে-ছিলাম যে পলাতক ডাকাতদের মধ্যে হয়তো কেউ নিশ্চয়ই আহত হয়ে থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকাও অসম্ভব নয়। কাজেই আমরা এখান থেকে সোজা দু-নম্বর ঘাঁটীতে না গিয়ে এখান থেকে আট মাইল দূরে একটী শ্যামবাসীদের পল্লীতে প্রথম খোঁজ করব স্থির করলাম। রাতে এখানেই বিশ্রাম করে পরদিন সকালে আমরা সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথে কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড়। বহু কষ্টে সেগুলি অতিক্রম করে আমরা গ্রামে উপস্থিত হলাম। এ গ্রামটী একেবারে ছোট নয়। কয়েকঘর শ্যামবাসীর এবং, শুধু একটী মাত্র চীনার বাড়ী। সেই চীনাটীও একটী শ্যামী মেয়ে বিয়ে করে এদের সঙ্গে মিশে গেছে। আহত কোনও লোক গ্রামে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। পরে প্রত্যেক বাড়ীতে অনুসন্ধান করেও

আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেলো না। তখন আমরা ফিরে এলাম আবার এক নম্বর ঘাঁটীতে।

রাতে এখানেই অপেক্ষা করে পরদিন আবার যাত্রা করলাম তুই নম্বর ঘাঁটীতে। ষোল মাইল পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামে উপস্থিত হলাম। গ্রামবাসীদের ডেকে তাদের কাছে সব খবর জিজ্ঞাসা করলাম। পরের দিন সকালে যে গ্রামে ডাকাতেরা হানা দিয়েছিলো সেই গ্রামে আমরা উপস্থিত হলাম। গ্রামবাসীরা তখনও ভয়ে গ্রামে আসে নি। যে বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিলো, সেই বাড়ীটী দেখলাম ছোট, একটী কুটির মাত্র। ছেঁচা বেড়া ভেদ করে কয়েকটী গুলীর দাগ। আমরা গ্রামবাসীদের ডেকে পাঠালাম। তারা বললে হয়তো ডাকাতেরা প্রতিশোধ নিতে পারে সেই ভয়েই তারা গ্রামে ফিরে আসতে পারছে না। তাদের অভয় দিয়ে জানালাম, এবার থেকে তুজন সিপাহী কিছুদিনের জন্য এই গ্রামেই থাকবে। আমাদের কথা শুনে তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে আসতে স্থুরু করলে। যে গ্রামবাসীটী আমাদের ঘাঁটীতে এসে খবর দিয়েছিলো তাকে পাঁচটাকা বকশিশ দেওয়া হোল। আমাদের ঘাঁটীর প্রত্যেকে তাদের সৎসাহসের জন্য তিনটাকা করে বকশিশ পেলো। জাপানী তাদের বাহাতুরীর জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করলে। আগেও ডাকাতের ভয়ে এই গ্রামে মাঝে মাঝে মালয়ী পুলিশের থাকার বন্দোবিস্ত হোত। কিন্তু ডাকাত পড়েছে খবর পেলে মালয়ী

পুলিশই সকলের আগে পালিয়ে যেতো। কাজেই গ্রামবাসীরাও আমাদের সিপাহীদের বাহাদুরীর যথেষ্ট প্রশংসা করে এবং যেন বরাবরই এখানে একটী রক্ষীদল রাখা হয়, তার জন্য জাপানীকে অনুরোধ করে। সেইদিনই আমরা আবার 'রাকিট' যোগে যাত্রা করলাম। একজন মালয়ী জাপানীকে ছোট্ট, একটী বাঁদর উপহার দেয়। এবারও সেই 'মুডা' নদীর উপরদিয়ে আমাদের 'রাকিট' ভেসে চলেছে। এবার কিন্তু যে কোন কারণেই হোক জাপানীটী বেশ গল্প সুরু করলে। বাঁদরটীকে কয়েকবার খাওয়াবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বললে 'ও' বেচারা home sick. জাপানীরাও চীনাদের মত বাঁদরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'জাপানীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবু তারা কেন মাংস খায়? বুদ্ধ দেবের বাণী 'অহিংসা পরমো ধর্ম' জাপানীরা মোটেই মানে না কেন? উত্তরে বললে আগে জাপানীরাও নিরামিষাশী ছিলো, কিন্তু ষাট বৎসর আগে সম্রাট মেইজী জাপানের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। অন্যান্য সভ্য দেশের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে হোলে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। দেশে একটি বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি করতে হবে। সৈন্য দলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমিষ ভোজন নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ জাপান শীত প্রধান দেশ। তারপর বিদ্যাভ্যাসের জন্য, বহু জাপানী যুবককে পাঠানো হোল দেশ বিদেশে। কাজেই বর্তমানে সারা জাপানের অধিবাসীই আমিষভোজী। তবে এখনও

বহু গোঁড়া আছেন, যাঁরা মাছ মাংস একেবারেই স্পর্শ করেন না।

জাপানী অফিসারের সঙ্গে আজ অনেক কিছু গল্প হোল। আজ পরিচয় পেলাম যে ভদ্রলোক বেশ উচ্চ শিক্ষিত। বাবা ছিলেন নাকি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ভারতীয়দের সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হোল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে ভারতবাসীরা তো বেশ বলবান ও সাহসী তবে আজও আট-ত্রিশ কোটী ভারতবাসী পরাধীন কেন? তাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবার মতো জ্ঞান আমার জাপানী ভাষায় ছিলো না, কাজেই অল্প কথায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কোথায় আমাদের দুর্বলতা। জাপানীরা আড়াই হাজার বছর ধরে, স্বাধীনতা উপভোগ করে আসছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে শুধু জাপানীরাই গর্ব করতে পারে যে আজ পর্যন্ত অন্য কোনও বিদেশী তাদের উপর রাজত্ব করতে পারে নি। আর আজও তাদের একই রাজবংশ রাজত্ব করছে। নিজের দেশের কথা বলতে বলতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লো; অনেক কিছু খবর জানালে নিজের দেশের সম্বন্ধে। স্বাধীন জাতি, দেশপ্রেম আছে, দেশের জন্য গর্ব এদেরই শোভা পায়। এদের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতেও আমাদের লজ্জা হয়। মনে প্রশ্ন জাগে আমরা আজ কোথায়? সর্ব বিষয়ে উন্নত হোলেও একমাত্র পরাধীনতা আমাদের গর্বের সব কিছু হরণ করেছে। বৃটিশ ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে এরা খুবই বিদ্বেষ পোষণ করে। ইংরেজীতে

কোনও কথা বলতে হোলেই আমাকে বলতো 'শত্রুর ভাষা বলতেও আমরা ঘৃণা করি। জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা বৃটিশ আমাদের ঘৃণা করে কেন? শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা কোন অংশেই জাপান হীন নয় তবু তারা আমাদের জাপানী না বলে, ঘৃণার সঙ্গে বলে 'জাপ'। দোষের মধ্যে হচ্ছে, আমরা এসিয়াবাসী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। জাপানীরা নিজেদের সূর্যের বংশধর বলেই পরিচয় দেয়, সেই জন্যই তারা নিজেদের বলে 'নিপ্‌পন'। সম্রাট তাদের কাছে দেবতা। সম্রাটের দিকে মাথা তুলে তাকাবার অধিকার সাধারণ জাপানীদের নেই। সাধারণতঃ জাপানী প্রথার অভিবাদন করতে হোলে সামনের দিকে অল্প ঝুঁকতে হয়। সম্রাট এবং দেবতার কাছে একেবারে ৪৫° ডিগ্রি ঝুঁকে অভিবাদন করতে হয় এর নাম হচ্ছে 'সাঁই খেরে'। এই রকম নানা গল্পে ও আলোচনায় আজ নদীপথের সারাক্ষণ আমরা কাটিয়ে দিলাম। আজ 'জাপানীর' মন হয়তো খুব ভালো ছিলো তাই এতো গল্প হোল। সন্ধ্যার আগেই আমরা এক নম্বর ঘাঁটীতে পৌঁছলাম। 'রাতটা এখানে কাটিয়ে পরের দিন একেবারে পৌঁছলাম 'কৌলা নারাঙ'।

জীবনে এতো পথ কখনো হেঁটে চলিনি! তার উপর জঙ্গল ও পাহাড়ের অতি দুর্গম পথ। ফিরে এসে যথেষ্ট ক্লান্তি অনুভব করলাম! পা দু'টো যেন একেবারেই অবশ হয়ে গেছে! সারা গায়ে ব্যথা! হিসাব করে দেখলাম এরমধ্যে হাঁটাপথে প্রায় তিনশো মাইল পথ হাঁটা হোল! যাক্ এবার

শুনলাম কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করা যাবে। ঘাঁটীগুলিতে সিপাহীরা চলে গেছে, অন্য কাজকর্ম কিছুই নেই কাজেই চুপচাপ শুধু আফিস ঘরটী অধিকার করে বসে থাকা। কয়েকদিন একটু বিশ্রাম করার মতো অবসর পেলাম।

আমাদের আফিসের খুব কাছেই একটী বাড়ীতে একজন মালয়ী স্কুল মাষ্টার থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে আবদুল্লা। আমার আফিসের পাশ দিয়ে রোজই যাতায়াত করতেন, কাজেই অল্পদিনেই তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ জমে ওঠে। মালয়ীরা সকলে মুসলমান হোলেও স্কুল মাষ্টারকে তারা 'গুরু' বলেই সম্বোধন করে। শুধু এই কথাটীই নয়, মালয়ী ভাষার মধ্যে বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। এই ভদ্রলোকের একটী ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে রোজই তাঁর সঙ্গে স্কুলে যেতো। বয়স বোধহয় সাত আট বছর হবে। মেয়েটীকে কাছে ডেকে আদর করার লোভ সংবরণ করতে পারতাম না—কাজেই তাকে প্রায়ই কাছে ডেকে ভাব জমাবার চেষ্টা করতাম। মেয়েটী বড়ই লাজুক। কিন্তু অল্পদিনেই তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। তাকে মেয়ে বলে ডাকতাম আর সেও আমাকে 'বাপো' বলে ডাকতো।

আত্মীয় বান্ধবহীন সুদূর মালয়ে আমি একা। প্রকৃত পক্ষে বন্দী এখানে নই তবু নাম তো বন্দীর তালিকায়। এখানকার সকলেই জানে এরা যুদ্ধবন্দী কাজেই জাপানীরা এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করছে। মাঝে মাঝে মন বড়ই চঞ্চল হয়ে

উঠতো। কতোবার ভেবেছি এখান থেকে পালিয়ে যাই শ্যামরাজ্যে, তারপর সেখান থেকে বর্মা। কিন্তু তাতেও ভয়ানক বিপদ আছে। শ্যামরাজ্য স্বাধীন হোলেও তখন জাপানীর সেখানে আধিপত্য। কাজেই ধরা পড়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তার উপর শ্যামের ভাষা মোটেই জানি না। কাজেই কোথাও লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করাও হবে অসম্ভব। আর একবার ধরা পড়লেই মাথাটাকে বিদায় দিতে হবে দেহ থেকে। আমি ও নয়নসুখ পালানোর বিষয়ে বহু আলোচনা করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখেছি একমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে, নীরবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তাই তো এই ছোট্ট মেয়েটীকে, নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসে অনেক সময় বাড়ীর কথা ভোলবার চেষ্টা করেছি।

মেয়েটীর নাম হচ্ছে 'কামারিয়া'—আদর করে সকলেই তাকে 'রিয়া' বলে ডাকে। আস্তে আস্তে মেয়েটী আমার হৃদয়ের অনেকখানি ভালোবাসা অধিকার করলো। রোজই সকালে সে আমার জন্য কফি ও কিছু মিষ্টি এনে হাজির করতো। আমাদের বাগান থেকে ফুল তুলে খোঁপায় পরতো, প্রতি সন্ধ্যায় এসে আমার সঙ্গে গল্প করতো। এখানে আসার পর থেকে জাপানীরা আমাকে হাতখরচ বাবদ মাসে পঁচিশ ডলার করে দিতো। আমার নিজের খরচের মধ্যে শুধু সিগারেট, কাজেই যা কিছু বাঁচতো সবই তার জন্য খরচ করতাম। বাইরের

লোকেরা জানতো না যে আমি কতো টাকা মাহিনা পাই, তারা ভাবতো পুলিশের কাজ, কাজেই মাহিনাও নিশ্চয়ই বেশ ভালো। তার বাবা মাঝে মাঝে আমার কাছে অনুযোগ করতো, মেয়েটীকে আদর ও পয়সা দিয়ে যে রকম করে তুলছেন, আপনি চলে গেলে কে তার তাল সামলাবে? আমাদের দেশের কতো কথা মেয়েটীকে শুনাতাম। সে বলতো আমি বড় হয়ে তোমাদের দেশে যাবো! যখন জানালাম, সে দেশের কেহই তোমার মালয়ীভাষা বুঝতে পারবে না, তুমি কারো সঙ্গে গল্প পর্যন্ত করতে পারবে না তখন সে আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতো, এমন আশ্চর্য দেশও আছে নাকি, যেখানকার লোকেরা মালয়ীভাষাটুকু পর্যন্ত জানে না! তার এই সরলতাপূর্ণ প্রশ্নে আমি খুবই আমোদ উপভোগ করতাম! এই মেয়েটীকে এমনিভাবে কাছে পেয়ে আমার বেশ আনন্দেই সময় কাটতো! জাপানী অফিসারটীও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খুব পছন্দ করতো। তার বাংলোতে জাপানী গান শেখার জন্য চার পাঁচটী ছোট ছেলে মেয়ে প্রায়ই উপস্থিত হোত। আমাকে বলতো তোমার তো মাত্র একটী মেয়ে আর আমার চার পাঁচটী। শুধু এই জাপানী অফিসারটীই নয়, আমি বহু জাপানীদের দেখেছি তারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে খুবই ওস্তাদ। যাঁদের বাপ মায়েরা জাপানী দেখলেই দূর থেকে নমস্কার করে সরে পড়ে, তাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু নির্ভয়ে জাপানী সিপাহীদের কাঁধের উপর

চড়ে আনন্দ উপভোগ করে! শুনেছি এটা নাকি জাপানীদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য!

আমাদের এখানে যে জাপানী দোভাষী আছে, সে ভদ্র-লোকটী নিতান্ত গোবেচারী! অফিসারটীর কাছে তাকে প্রায়ই তাড়া এবং মাঝে মাঝে চড়চাপড়টাও সহ্য করতে দেখেছি! আমার কাছে এসে মাঝে মাঝে নানা গল্প করতো। যুদ্ধের আগে সিঙ্গাপুরে তার একটি হোটেল ছিলো! যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে তাকে অন্যান্য জাপানীদের সঙ্গে বন্দী করে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। মুলতান ও দেউলালী ক্যাম্পে প্রায় ছয়মাস থাকার পর প্রথম যুদ্ধ বন্দী বিনিময়ে ছাড়া পায়! তারপর এদেশে পৌঁছানর পর আমাদের সঙ্গে দোভাষী হয়ে আসে। আমাকে বলতো, "ভারতবর্ষের লোক খুবই গরীব বলে মনে হয়। বোম্বেতে ট্রেণে যাওয়ার পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে যথেষ্ট লোককে ভিক্ষা করতে দেখেছি। তাদের পোষাক ও শীর্ণদেহ দেখেই মনে হয় এরা বহুদিন বুভুক্ষিত।" এরা প্রত্যেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জানে আর মহাত্মা গান্ধীর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। গান্ধী এরা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না তাই বলে 'গান্জী'। এখানকার অফিসে কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু ছিলো না! দুমাস অফিস খোলার পর, মাত্র একটী ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে একজন চীনা ব্যবসায়ীকে ব্যাঙ্কক যাবার জন্য!

জাপানী অফিসার ও'হারা মাঝে মাঝে আমাদের তলোয়ারের

নানা কাহিনী শোনাত। এদের বাড়ীতে বংশের একটি করে তলোয়ার থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে বড় ছেলে তার অধিকারী হয়। সর্বপ্রথম যখন সূর্যের বংশধর জাপানের সম্রাট হন, তখন এক দেবী তাঁকে একটী তলোয়ার, একটী নেকলেস ও একটী বীচির মতো জিনিষ উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন যে,—"জাপানীরা চিরদিন স্বাধীনতা ভোগ করবে ও একই রাজবংশ চিরদিন রাজত্ব করবে।" এই তিনটী জিনিষ বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে একটী মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। সেই পবিত্র জিনিষগুলি আজও সেই মন্দিরে আছে। বর্তমানে যে সব তলোয়ার তৈরী হয় সেগুলি সবই বিশেষভাবে ও খুব পবিত্রতার সঙ্গে তৈরী করা হয়। শেষ হলে মন্দিরে রক্ষিত সেই পবিত্র তরবারির স্পর্শ দেওয়া হয়, প্রত্যেকটী তলোয়ারে। কাজেই প্রত্যেকটী তলোয়ারই হচ্ছে মন্ত্রপূত ও পবিত্র। এই তলোয়ারের মধ্যেও আবার নানা রকম ভেদ আছে। এক রকমের তলোয়ার আছে যা' একবার খাপ থেকে বা'র করলে, বিনা রক্তদানে তাকে আবার খাপের ভিতরে ঢোকানো নিষিদ্ধ। এরা এই অস্ত্রটী নানা কাজে ব্যবহার করে। যারা বেশ ভালোভাবে শিক্ষা পেয়েছে, তারা উপর থেকে ফেলে দেওয়া একটি ডিম শূন্যে অবস্থান কালেই অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে। জাপানীরা আত্মরক্ষায় খুবই তৎপর। জুডো অর্থাৎ আত্মরক্ষার বিভিন্ন কায়দা এরা বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা পায়। আমরা ছেলেবেলাতে জাপানী 'জুজুৎসুর' নাম শুনেছি। আমাদের জাপানী

অফিসারটীকে দেখেছি, অলসতার প্রশ্রয় এরা মোটেই দেয় না।

দুপুরের দিকে আমাদের বিশেষ কাজ ছিলো না, কাজেই জাপানী প্যারেড সুরু করে দিলে। ঘাঁটীর সিপাহীদের মাসে একবার করে বদলীর বন্দোবস্ত করা হোল। এক একদিন আমরা শুধু মাইলের পর মাইল দৌড়তাম। বলা বাহুল্য ভালো খাওয়া ও শারীরিক ব্যায়াম দুয়ে মিলিয়ে আমাদের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হোতে লাগলো। তবে যারা ঘাঁটীতে থাকতো তাদের মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হোল। আমরা আগে যে বাংলোটিতে থাকতাম, সেটিকেই আমি কতকটা হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করতাম। যাভা জয় করার পর জাপানীদের মোটেই কুইনাইনের অভাব ছিলো না, কাজেই আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন পেতাম। অন্যান্য কঠিন রুগীদের এলোরষ্টার হাসপাতালে ভর্তি করতাম। এই হাসপাতালের ডাক্তারগণ সকলেই ভারতীয়।

এইভাবে দুঃখে ও সুখে কোনও রকমে দিন কেটে চলেছিলো হঠাৎ আবার একদিন টেলিফোন পেলাম যে আমাদের লোকেরা নাকি কিছু ডাকাত ধরেছে। প্রায় আঠারো মাইল দূরে সেই থানাতে উপস্থিত হলাম। কয়েকদিন থেকেই আমার শরীর অসুস্থ ছিলো তবুও যেতে বাধ্য হলাম। থানায় পৌঁছে দেখি আমাদের সিপাহীরা প্রায় আঠারোজন শ্যামীকে ধরে এনেছে। ব্যাপার হচ্ছে এই যে এক নম্বর ঘাঁটীর কাছাকাছি যে শ্যামী

গ্রামে আমরা আহত ডাকাত ধরার আশায় হানা দিয়েছিলাম সেই গ্রামের অধিবাসীরা বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়ে। তাদের নাকি কা'রা ভয় দেখিয়েছে যে জাপানীরা তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে। সেই ভয়ে সারা গ্রামের লোক সেখান থেকে পালিয়ে শ্যাম রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করে। দুদিন পরে আমাদের এক নম্বর ঘাঁটীর সিপাহীরা খবর পেয়ে জঙ্গলে তাদের আটকাবার চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা আমাদের সিপাহীদের উপর গুলী চালায়। আমাদের সিপাহীও তাদের ভয় দেখাবার জন্য কয়েকবার গুলী ছোঁড়ে। তখন তাহারা বাধ্য হয়ে ধরা দেয়। এই দলে সর্বশুদ্ধ প্রায় সত্তর জন লোক ছিলো। আঠারোজন পুরুষকে তারা আগেই থানায় নিয়ে এসেছে। অন্যান্য শিশু ও মেয়েদের তারা এনেছে এখান থেকে দশ মাইল দূরে একটী গ্রামে। এই দলে মাত্র দুইটী বন্দুক পাওয়া যায়, একটী গাদা বারুদের অন্যটী ষোল বোরের ছড়রা বন্দুক।

এখানকার আঠারোজন লোককে বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও জানতে পারা গেলো না, যে বন্দুক দুটী কার? এর আগেও আমরা এই গ্রামে গিয়াছিলাম, সেদিন বহু অনুসন্ধান করেও কারো বাড়ীতে কোন অস্ত্রাদি পাই নি। কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে-এরা বন্দুকগুলি সেদিন জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিলো। রাত প্রায় তিনটে অবধি এদের নানা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হোল। জাপানা অফিসার সেই ভোর বেলাতেই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। আমার উপর হুকুম হোল, আমি যেন

সকালবেলা এখান থেকে দশ মাইল দূরের গ্রামে যাই এবং মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দরকার মতো তাদের ছেড়ে দিই। রাতে থানাতেই শুয়ে রইলাম। পরদিন সকালে উঠে সাইকেলে রওয়ানা হলাম। গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই একজন দোভাষী জোগাড় করলাম, কারণ এরা মালয়ীভাষা খুব অল্পই জানে। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম যে, একটী বন্দুক হচ্ছে সেই চীনাটীর আর অন্যটী হচ্ছে গ্রামের সর্দারের। তাদের সকলকে আবার গ্রামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলাম।

সেই চীনাটী, গ্রামের সর্দার ও অন্য দু'জনকে আটকে রেখে জাপানী অন্যান্যদের ছেড়ে দিলে। কিছুদিন পরে অন্য তিন জনকেও ছেড়ে দিয়ে শুধু চীনাটীকে আটকে রাখলে। একে তো চীনাদের উপর জাপানীদের আক্রোশ, তার উপর বেচারা ধরা পড়েছে বন্দুক সমেত। আগেও নাকি এক বার বৃটিশ আমলে সে কোনও অপরাধের জন্য জেল খেটেছে, কাজেই তার অপরাধের সাজা হচ্ছে চরম শাস্তি। আমাদের পাশের ঘরে যেখানে ষ্টোর ছিলো সেখানেই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জাপানীর তরফ থেকে খুব কতকগুলি কঠিন হুকুম ছিলো তার উপর। যেমন, সকালে মাত্র একবার তাকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঘর থেকে বার করা হোত। খেতে দেওয়া হোত শুধু নুন ও ভাত। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলাও বন্ধ ছিলো। তবে জাপানীটী হাজির না থাকলে আমি যতটা সম্ভব তার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করতাম।

লোকটী আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতো। তার নিজের জীবনের কাহিনী সে আমাকে শুনিয়েছে, বলেছে মৃত্যুকে আমি ভয় করি না কিন্তু আমার শুধু ভাবনা রয়ে গেলো আমার মেয়েদের জন্য। চারটী মেয়ে, সকলেই বয়স্থা অথচ অবিবাহিতা, ছেলে একটীও নেই। কাজেই তাদের অবস্থা স্মরণ করেই আমি দুঃখিত। মেয়েদের মাঝে মাঝে দেখার জন্য আমাকে বহুবার অনুরোধ করেছে। মৃত্যুপথ যাত্রীর দুঃখের কাহিনী শুনে দুঃখিত হোলেও আমি উপায়হীন। নিজে আমি বন্দী, অপরকে আর কি সাহায্য করতে পারি? জানাতে পারি শুধু হৃদয়ের সহানুভূতি, আর ফেলতে পারি দুফোঁটা চোখের জল।

কাছাকাছি রবার জঙ্গলে জাপানী একটী বড় গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল আমাদের সিপাহীদের দিয়ে। একদিন সকালে হঠাৎ দেখি জাপানী অফিসার পুরোপুরি ইউনিফরম পরে অফিসে এসে হাজির। সাধারণতঃ এ বেশে সে অফিসে আসে না। একপাশে ঝুলছে পিস্তল আর হাতে সেই বিরাট তলোয়ার। আমাদের উপরেও সাজ পোষাক পরবার হুকুম হোল। তারপর বললে আজ এই চীনাটীর মাথা কাটা হবে, আমাদেরও উপস্থিত থাকতে হবে, দেখবার জন্য। জীবনে মানুষ কাটাও দেখতে হবে! কিন্তু উপায় নেই, হুকুম মানতেই হবে, দেখতে হবে সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোল। আশ্চর্য, সব কিছু জানা সত্বেও চীনাটী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তার চোখে এক ফোঁটা

জল নেই, মুখে একটু কাতরোক্তি নেই। আমাদের দেশের ছেলেরা যে হাসিমুখে ফাঁসির দড়িতে কেমন করে গলা বাড়িয়ে দিতে পারে তা কতকটা অনুভব করতে পারলাম এই দৃশ্য দেখে। নিজে হেঁটেই বধ্যভুমিতে উপস্থিত হোল। আমি ভেবেছিলাম হয়তো সে কান্নাকাটি করবে, হয়তো বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা করে হঠাৎ আক্রমণ করবে। কিন্তু কিছুই হোল না। নীরবে সে গিয়ে বসলো গর্তের পাশে। জাপানী তার বিরাট তলোয়ার খুলে তৈরী হোল। আমরা ভয়ে চোখ বুজলাম। তারপর চোখ খুলতেই দেখি চীনাটীর ছিন্ন মাথাটী পড়েছে একেবারে গর্তের ভিতরে, ধড়টা পড়েছে বাইরে গর্তের পাশে। ফিনকী দিয়ে দূর পর্যন্ত রক্তধারা ছুটেছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেলো, চুপচাপ বসে পড়লাম একটী গাছের তলায়। খানিক বাদে তার ধড়টা টেনে গর্তের মধ্যে ফেলে তার উপর মাটী চাপা দেওয়া হোল। জাপানী মুহূর্তের মধ্যে তার জল্লাদ মূর্তি বদলে একেবারে সাদাসিদে ভদ্র-লোকটীর মতো মাথার টুপী খুলে মৃতদেহকে জানালে সম্মান। চোখ বুজে খানিকটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে হয়তো চীনাটীর আত্মার উদ্দেশ্যে। আশ্চর্য বটে, এ যেন কতকটা 'গরু মেরে জুতোদানের' মতো অবস্থা। তবে এ ঘটনা বহুবার দেখেছি- জীবিত শত্রুকে তারা কষ্ট দিলেও, মৃত শত্রুকে তারা যথোচিত সম্মান জানায়। মৃত্যুর পর যে আর শত্রুতা থাকে না, সেটা জাপানীরা মানে। এখানকার বেসামরিক অধিবাসীরাও এ দৃশ্য

দেখেছে। তারা সকলেই বেশ ভীত হয়ে পড়েছে! জাপানী-দের নৃশংসতার কাহিনী অনেকের কাছে শুনেছি, কিন্তু আজকার এই ঘটনা দেখে বুঝলাম সত্যই জাপানীরা সভ্য হোলেও তাদের কতকগুলি আচরণ সভ্যজনোচিত নয়। যুদ্ধের সময় গুপ্তচর প্রভৃতিদের গুলী করে মারার প্রথা সব দেশেই আছে, কিন্তু বর্তমান যুগে ঠিক পুরাতন জল্লাদের মতো শিরশ্ছেদ হয়তো আর কোনও দেশেই সম্ভবপর নয়। দৃশ্যটাই বেশ ভয়াবহ, তা'ছাড়া অবশ্য ফাঁসি, গুলি করে করে মারা প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই।

মৃতদেহটী সমাহিত করে আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেই দৃশ্যটী। সারাদিন শুধু একই চিন্তা একই আলোচনা। জাপানীতো নির্বিকার ভাবে জল্লাদের কাজ সেরে আবার হাসিমুখে তার বাংলোয় ফিরে গেলো। সে বললে, সে শুধু তার কর্তব্য মাত্র করেছে। অথচ আমাদের মনে হচ্ছে এ দৃশ্য আমরা জীবনে ভুলতে পারবো না। চীনাটীকে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করতে দেখে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না। মৃত্যুর আগে তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখি নি, মুখে একটুও কাতরোক্তি শুনিনি। এমন করেও যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে, একথা মাঝে মাঝে শোনা থাকলেও আগে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

ছোট্ট কৌলা নারাঙ্ সহরের অধিবাসীরা এই ঘটনার কথা শুনে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। এর পর থেকে এরা

ও'হারাকে দেখলেই দূর থেকে অভিবাদন করে সরে পড়তো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ভয়ে ভয়ে তার কাছে যাওয়া বন্ধ করলে।

চীনাটীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটে। রাতে আমাদের অফিসে একজন প্রহরী পাহারা দিতো, অন্য তিনজন শুয়ে থাকতো। তার সময় শেষ হলে সে অন্যকে জাগিয়ে বিশ্রাম করতো। একদিন রাতে যে তিনজন শুয়েছিলো তাদের মধ্যে একজন বেশ জোরে চীৎকার করে ওঠে "আমি তো শুধু গর্ত খুঁড়েছি, এতে আমার কোনও দোষ নেই! দোষ যতো কিছু ঐ জাপানীর।" ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় সে জানালো, ঘুমের ঘোরে সে দেখে যে চীনাটি তাকে আক্রমণ করতে আসছে তাই সে ভীত হয়ে এই কথাগুলি বলে। বেচারার দোষের মধ্যে শুধু গর্ত কাটা! পরের রাতে আমার পাশের বিছানায় সাব অফিসার নয়নসুখও এমনিভাবে চীৎকার করে ওঠে। তাকেও নাকি চীনাটি আক্রমণ করতে এসেছিলো। ব্যাপারটি বেশ জটিল হয়ে উঠলো পরের রাতে! রাত তিনটের সময় জাপানী টেলিফোনে তৎক্ষণাৎ তার বাংলোয় যাওয়ার জন্য হুকুম দিলে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না, এতো গভীর রাতে এতো কি জরুরী তাড়া। যাই হোক একজন প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাংলোয় উপস্থিত হলাম। দেখলাম জাপানী বেশ জোর আলো জ্বেলে, টেবিলের পাশে বসে বসে 'ঢুঁধ' খাচ্ছে। আমাকে দেখে বললে দেখতো ডাক্তার আমার জ্বর

হয়েছে কিনা? ঘুমের ঘোরে হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা অনুভব করে উঠতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে ওঠে। নাড়ীতে জ্বরের কোনও লক্ষণ দেখলাম না। বললাম 'হয়তো হার্টের কোন অসুখ হয়েছে, কাল একবার এলোর ষ্টার হাসপাতালে গিয়ে দেখালে ভালো হয়।' রাতে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করার উপদেশ দিলাম, কিন্তু না শুয়ে আমাকে বললে আজ রাতে তুমি এখানেই শুয়ে থাকো। মনে মনে বিশেষ ভীত হয়ে পড়লাম, ব্যাপার কি? খারাপ মৎলব কিছু নেই তো? কিন্তু হুকুম মানা ছাড়া উপায় নেই কাজেই, প্রহরীকে বিদায় দিয়ে অগত্যা সেখানেই একটী ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লাম! ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী আমাকে তুলে দিয়ে বললে তুমি এখন ফিরে যাও; তোমার কষ্টের জন্য ধন্যবাদ।" পরের দিন সিপাহীদের কাছে বলতেই তারা বললে, নিশ্চয়ই ঐ চীনার আক্রমণ। পরদিন জাপানী টেলিফোনে জানিয়েছিলো যদি কোনও কাজ থাকে আমি যেন তাকে টেলিফোনে খবর দিই! কাজ কিছুই ছিলো না, কাজেই তিনদিন তার বিশ্রামেরও কোন ব্যাঘাত করি নি।

দ্বিতীয়বার আবার আমাকে একবার সব ঘাঁটিগুলিতে যেতে হয়েছিলো, সিপাহীদের মাহিনা দেওয়া ও তাদের দেখাশুনা করার জন্য। তিন নম্বর থেকে চার নম্বর ঘাঁটিতে যাওয়ার সময় এবার বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। দলে ছিলাম আমরা ছ'জন, আমি এবং পাঁচজন সিপাহী। ঘাঁটি থেকে

প্রায় দুই মাইল পথ যাওয়ার পরই এক জায়গায় গাছের ডালপালা ভাঙ্গার শব্দে ভীত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমরা বিশেষ-ভাবে ভীত হয়ে পড়লাম। আমাদের থেকে মাত্র তিন চারশো গজ দূরে কয়েকটী হাতী জঙ্গল ভাঙ্গছে। জঙ্গলে ভ্রমণ এই তো প্রথম, তারপর সামনেই কয়েকটী অতিকায় হাতী, যেন এক একটী চলন্ত পাহাড়। এই অবস্থায় কি করবো কিছুই ঠিক করতে না পেরে, কাছাকাছি একটী বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। সঙ্গের মালয়ী 'গাইডও' হাতী দেখে ভীত হয়ে পড়েছে, তবু বললে ওরা আওয়াজকে খুব ভয় করে, কাজেই কয়েকটী বন্দুকের আওয়াজ করলেই ওরা পালিয়ে যাবে। আমি পাঁচজন সিপাহীকেই একসঙ্গে গুলী ছুঁড়তে বললাম একটী করে। জঙ্গলে সেই বন্দুকের আওয়াজ ও তার প্রতিধ্বনি উঠলো ভীষণ-ভাবে। কিন্তু হাতীগুলি তবুও নির্বিকারভাবেই গাছের ডালপালা ভাঙ্গতে লাগলো। এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব, আবার পিছিয়ে আসাও যায় না, কাজেই সিপাহীদের হুকুম দিলাম চালাও বেপরোয়া গুলী, তারপর দেখা যাবে কি হয়। এক সঙ্গে পাঁচটী রাইফেল গর্জে উঠলো। মুহুর্মুহু গুলীবৃষ্টি হ'তে লাগলো হাতী-গুলির উপর। এক একবার তারা চীৎকার করে উঠতে লাগলো। আমরা গাছের আড়াল থেকেই দেখলাম এবার তারা তাদের বিপদ বুঝতে পেরে পালাবার চেষ্টা করছে। অন্যগুলী পালাতে পারলেও দু'টী সেখানেই পড়ে গেলো। দুটী মারা যাওয়ায়

এবং অন্যগুলী পালিয়ে যাওয়াতে আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, মৃতদেহে যেন আবার প্রাণ সঞ্চার হলো। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটী মাদী, অপরটী একেবারেই শিশু। দাঁত কোনটীরই ছিলো না। সব শুদ্ধ পচাঁত্তরটী গুলী ছোড়ার এই ফল। সঙ্গের মালয়ীটী একটী বিরাট ছুরি বার করে, ছোট হাতীটীর মুখের পাশ কেটে প্রায় দু'ইঞ্চি লম্বা ও এক আঙ্গুল মোটা দুটী দাঁত বার করলে। শুনেছি শিকারীরা হাতীর মাথা অথবা কান লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে কারণ শরীরে মারলে, বিশ ত্রিশটী বুলেট হাতী অনায়াসে হজম করতে পারে। কিন্তু আমরা শিকার জানি না, নিশানাও সকলের পাকা নয়, কাজেই প্রাণভয়ে আন্দাজেই গুলি চালানো হয়েছিল। তারপর এবার আমরা রওয়ানা হলাম ঘাঁটি অভিমুখে। তখনও প্রাণে ভয় আবার যদি পথে দেখা হয় তাদের সঙ্গে, আবার যদি তারা আক্রমণ করে তা'হলে অবস্থা কি হবে? প্রত্যেকের সঙ্গে ছিলো মাত্র কুড়িটী বুলেট তার মধ্যে পনেরটী করে শেষ হয়েছে। যাই হোক ভগবানের কৃপায় আমরা নিরাপদেই চার নম্বর ঘাঁটিতে এসে পৌছলাম। ফেরার পথে তিন নম্বর ঘাঁটি থেকে জাপানীকে টেলিফোনে আমাদের বিপদের কথা জানালাম। জাপানী খুব খুশী হয়ে জানতে চাইলে আমরা হাতীর দাঁত পেয়েছি কিনা? দাঁত নেই শুনে একটু মনঃক্ষুন্ন হলো তা বেশ বুঝলাম।

ফিরে এসে আমরা পরদিনই আবার যাত্রা করলাম। এবার

পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নম্বর ঘাঁটিগুলি একসঙ্গে শেষ করে ফিরে আসবো ঠিক করলাম। অনবরত শুধু হেঁটেই চলেছি। তারপর আগে তবু অনেকটা নির্ভয়ে পথ চলতাম এখন আবার ঘন নিবিড় বন দেখলেই ভয় লাগে। পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বর শেষ করে আট নম্বর ঘাঁটিতে রওয়ানা হলাম, নূতন একটী পথে। দু'টী পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট একটী উপত্যকা। চারিদিকে ঘন জঙ্গল, ভিতরে সূর্যের আলোর প্রবেশ নিষেধ। পথ কিছুই নেই। রাশীকৃত পাথর পড়ে আছে। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের ডাল পালা আমাদের পথ রোধ করতে লাগলো। মালয়ী গাইড দা দিয়ে সেগুলি কেটে কেটে আমাদের জন্য পথ তৈরী করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও বা পায়ের পাতা পর্যন্ত। অসংখ্য ছোট বড় জোঁকের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এ পথের অবস্থা যে খুবই খারাপ তা আগেই শুনেছি তবু একটু নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্যই সোজা পথে না গিয়ে এই পথে এসেছি। ছেলেবেলা থেকেই জঙ্গলের বহু কাহিনী পড়েছি, কিন্তু তা যে সত্যই কতো ভীষণ বিভীষিকাময় তা আগে কোন দিনই ধারণা করতে পারিনি। বহু কষ্টে মাত্র তিন মাইল পথ, তিন ঘণ্টাতে অতিক্রম করে আমরা, আমাদের গন্তব্যস্থল আট নম্বর ঘাঁটীতে উপস্থিত হলাম। কাজ সেরে সেদিনই ফিরে এলাম 'কৌলা নারাঙ্'।

প্রথমে যখন আমাদের সীমান্ত রক্ষীদলে ভর্তি করা হয়, তখন জাপানীরা বলেছিলো যে মাত্র চার মাসের জন্য আমাদের

নিয়ে যাওয়া হবে। মালয়ীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাদের শিক্ষা শেষ হলেই আমাদের আবার বন্দী শিবিরে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেলো চার মাস পরে আমাদের দলে যোগদান করলে মাত্র একজন মালয়ী অফিসার ও চারজন মালয়ী সিপাহী। শুনলাম অন্যত্র পুলিশের কাজে তাদের নেওয়া হয়েছে, কাজেই সীমান্ত রক্ষীদলে বেশী মালয়ী পাঠানো অসম্ভব। এরা পাঁচজনেই স্থানীয় ডাক বাংলোতে থাকতো। মালয়ী অফিসারটীর বয়স খুবই কম, মাত্র একুশ বাইশ বছর খুব সুন্দর চেহারা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর, বৃটিশের পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে, তারপর জাপানীর আমলেও সে পুলিশে কাজ করতো। নাম গজআলি। চলতি জাপানী-ভাষা বেশ ভালোভাবেই বলতে ও বুঝতে পারে। তার মাহিনা হচ্ছে মাসিক একশো পঞ্চাশ ডলার আর মালয়ী সিপাহীদের চব্বিশ ডলার। আমি পেতাম মাসে পঁচিশ ও সিপাহীরা পেতো মাসে নয় ডলার। অবশ্য আমাদের খাওয়া, থাকা ও পোষাকের কোন দাম লাগতো না। যদিও আমরা একই সঙ্গে একই কাজ করতাম তবুও আমরা হচ্ছি যুদ্ধ বন্দী, কাজেই মাহিনার এতো-খানি পার্থক্য।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়। জাপানী অফিসারটীও ক্রমে ক্রমে সব কাজ আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হয় বাংলোতে নয়তো এলোর ষ্টারে সময় কাটাতো। অফিসে খুব কমই আসতো, কাজেই আমরা বেশ আরামে

টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে গল্প করতাম আর কাপের পর কাপ কফি ধ্বংস করতাম। একদিন বিশেষ কাজে জাপানীর বাংলোতে গিয়ে তাকে ডাকতেই দরজা খুলে দিলে একটী চীনা তরুণী। প্রথমে একটু আশ্চর্য হলাম। অবশ্য মাঝে মাঝে তার বাংলোতে যে বাইরে থেকে মেয়েদের আমদানী না হোত তা নয় তবে দিনের বেলা কাউকে আগে দেখি নি। দরজা খুলে জাপানী প্রথায় অভিবাদন করে আমাকে ঘরে বসতে অনুরোধ করলে। আমি বাইরের 'লনেই' পায়চারী করতে লাগলাম। খানিক পরে আর একটী চীনা তরুণী বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে আমাকে ঘরে এসে বসতে বললে। দু'জনই এ বাড়ীতে নবাগতা। জাপানীদের মধ্যে অনেক গুণ থাকলেও আমাদের চোখে যেটী দৃষ্টিকটু, সেই দু'টী অর্থাৎ নারী ও সুরার প্রতি এদের অতিরিক্ত টান। এরা আসার পর থেকেই জাপানী বাইরের কাজে একটু ঢিলা দিয়েছে। তাতে অবশ্য আমাদেরই সুবিধা।

একদিন হুকুম হলো—আমি ও গজ-আলি প্রত্যেক গ্রামের লোক গণনা করবো। কাজেই আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্য আগে থেকেই পুলিসে এ-কাজ শেষ করেছে, তবু আমাদের তরফ থেকেও লোকসংখ্যা গণনা করে তার রেকর্ড রাখা দরকার। জাপানীরা আসার পর এ-দেশের পুলিশের কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। এখানকার প্রত্যেক থানার এলাকার মধ্যে যতো লোক আছে, তাদের সকলের নাম থানায় রেজেস্টারী করা

আছে। প্রত্যেক বাড়িতে একটি ছাপানো কাগজে বাড়ির মালিকের নাম, বাড়ির অন্যান্যদের নাম ও বয়স সব লিখে টাঙ্গানো আছে। এ ছাড়া নূতন কোনও লোক গ্রামে এলেই তাকে আগে খবর দিতে হবে গ্রামের সর্দারদের কাছে, সে আবার খবর দেবে থানায়। এর সুবিধা হচ্ছে হঠাৎ বাইরের চোর ডাকাত প্রভৃতি অন্য গ্রামে আশ্রয় নিতে পারে না। একটি গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অথবা কমে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরা পড়ে। জাপানী আমাকে বলেছে, তাদের দেশেও এই ব্যবস্থা। তারা নিজেরা জাপানী পুলিসকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুলিস ব'লে গৌরব বোধ করে। অবশ্য এটা কতোখানি সত্য, তা বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এইভাবে নাম লেখার আবার অনেকগুলি সুবিধাও আছে। আমাদের দেশের মতো শুধু চোর ডাকাতের নামই পুলিসের খাতায় থাকে না। এলাকার সারা অধিবাসীর নাম তাতে থাকে। একটি বড় সহরেও একজন লোককে খুঁজে বার করা খুবই সোজা। উদাহরণস্বরূপ হয়তো টোকিও শহরে আমি ফুজিয়ামাকে খুঁজছি। টোকিও শহরে হয়তো সবশুদ্ধ পাঁচ হাজার ফুজিয়ামা আছে। যখন আমি জানালাম, আমার ফুজিয়ামা ডাক্তার, তখন হয়তো দেখা গেলো—দু'শো ডাক্তার আছে ঐ গ্রামে। তারপর যখন বললাম, সে বিবাহিত ও তার তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তালিকা খুলে দেখা গেলো এ রকম ফুজিয়ামা হয়তো মাত্র দু'টি কি তিনটি আছে।

তখন তাদের খুঁজে বার করা খুবই সহজ। এই প্রথা জাপানীরা এখানেও চালাতে শুরু করে। কাজেই থানায় গিয়ে খোঁজ করলেই চোর ডাকাত ছাড়াও নিতান্ত ভদ্রলোকেরও সব কিছু খোঁজ পাওয়া যাবে।

মালয়ের গ্রামগুলি থেকে আমাদের দেশের গ্রামের সত্যি অনেক পার্থক্য আছে। এদেশে মাত্র তিনটি বাড়ী নিয়েও একটি গ্রাম। অধিবাসী সবশুদ্ধ মাত্র চৌদ্দজন। আর সবচাইতে বড় গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা দু'শো ষাটজন। এবার এদিকে একটি 'আদর্শ' গ্রাম দেখলাম। এই গ্রামে যা জমি চাষ হয়, ছাগল গরু প্রভৃতি যা কিছু আছে—সবই সমবায় প্রথায় ব্যবহৃত হয়। এখানকার প্রত্যেক জিনিসে প্রত্যেকের অধিকার আছে। এমন কি বিবাহটি পর্যন্ত কতকটা ঐ প্রথার মধ্যে পড়ে। অন্য গ্রামের ছেলে বা মেয়ের সাথে এ গ্রামের কারো বিয়ে হয় না। কাজেই আশ্চর্য হ'য়ে দেখেছি—স্বামীর বয়স পঞ্চাশ স্ত্রী মাত্র বিশ। কারণ যেভাবে এই গ্রামের মেয়ে বা ছেলে পাওয়া যাবে, সেইভাবেই বিয়ে হবে। অবশ্য মালয়ীদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ যথেষ্ট হয়, আর বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। এ গ্রামের লোকেরা বিশেষ দরকার ছাড়া বাইরে কোথাও যায় না। একজন গায়ে জামা দিয়েছিলো—খানিক পরে জামা খুলে ফেলে বললে, জামা গায়ে দিলে গা কুট্‌কুট্‌ করে। অশিক্ষিত সরল এই গ্রামবাসীদের সমবায়-চাষ ও বসবাস দেখে বিশেষ আনন্দিত হলাম।

এবার জঙ্গলের একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার সময় আমরা একদল 'সাকাই জাতি' দেখলাম। এরাই হচ্ছে আদিম মালয়ের অধিবাসী। বর্তমানে যাদের মালয়ী বলা হয় তারা প্রায় পাঁচ ছ'শো বছর আগে যাভা, সুমাত্রা, বলীদ্বীপ প্রভৃতি থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। তারপর, এদিকে আরবদের সংস্পর্শে এসে এরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। কাজেই সারা মালয়ীরা জাতিতে মুসলমান হলেও তাদের অনেক আদব কায়দা ও ভাষার মধ্যে পুরাতন হিন্দু সংস্কৃতি আজও যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সাকাইরা জঙ্গলেই থাকে। লোকালয়ে বড় একটা আসে না। এদের দলে প্রায় ছ'জন পুরুষ, আট জন মেয়ে ও গোটা দশ শিশু ছিলো। মাত্র একজন পুরুষ মালয়ী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারে। পরিধানে শুধু একটু মাত্র কৌপিন, পুরুষ ও নারীর লজ্জা নিবারণ করছে। বছর আট দশের ছেলে মেয়েদের ও বালাইটুকুও নেই। এরা একেবারেই অসভ্য। জঙ্গলে পাহাড়ে বন্য শাকসবজি প্রভৃতি খেয়েই জীবনধারণ করে। মাঝে মাঝে পশু পক্ষীও শিকার করে। তীরধনুক এরা ব্যবহার করে না। এদের শিকারের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে গরু বা মহিষের শিঙের চোঙ্গের মধ্য দিয়ে ছোড়া সূ'চের মতো ছোট বিষাক্ত তীর। শিঙের মধ্যে ফু দিয়ে এরা দু'শো গজ দূর পর্যন্ত নিশানা নিয়ে পশু পক্ষী শিকার করতে পারে। অবশ্য বলা বাহুল্য, এই তীর দিয়ে বাঁদরের চাইতে বড় পশু বা জানোয়ার শিকার করা অসম্ভব। তীরটি এতোই বিষাক্ত যে

বিদ্ধ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। এরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে এরা জঙ্গলের পথে ঘোরাফেরা করে।

প্রকৃত ধর্ম বলতে এরা কিছুই বোঝে না, মানুষ মারা গেলে কবর দেয়। বিবাহ প্রথা নেই বললেই হয়, দলের একটি নারীকে সঙ্গে রাখলেই তারা স্বামী স্ত্রীর মতো ব্যবহার করে।

অনেকক্ষণ সেই জঙ্গলের একটি পাথরে বসে বসে আমরা এদের সঙ্গে গল্প করলাম। আর আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে যে এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কারণ এরা লোকালয় থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসে। জঙ্গলেও মানুষের সাড়া পেলে গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। এদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও অনেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। প্রায় দশ দিন এইভাবে নানা গ্রামের লোকসংখ্যা গণনা করে আমরা আবার আমাদের হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলাম।

মালয়ে ঋতুর মধ্যে আছে শুধু বর্ষা। তবু জুন জুলাইয়ের দিকটাতে গরম বলে এই সময় মালয়ের বিশ্ববিখ্যাত ফল ডুরিয়ান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দেখতে কতকটা কাঠালের মতো। তবে একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়! এইটি Passion fruit. সিঙ্গাপুর, পেনাঙ প্রভৃতি বড় বড় সহরে টাকায় একটি দুটি করে ফল বিক্রয় হয়। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামেও খুব সস্তা। মাত্র চার ছ' পয়সায় একটি বড় ফল পাওয়া যায়। অন্য সময় গ্রামের লোকেরা

বিশেষ কাজ ছাড়া শহরে না এলেও ডুরিয়ানের সময় দিনরাত ঝাঁকা ঝাঁকা ফল নিয়ে এরা স্ত্রী পুরুষে শহরে বিক্রি করতে আসে।

এই সময়টা এরা ফল বিক্রি করে বেশ দু' পয়সা উপায় করে, কিন্তু সৌখিন জাতি এরা—পয়সা মোটেই জমাতে জানে না। কাফেতে খেয়ে খেয়ে ভালো কাপড় জামা কিনে দুদিনেই সব পয়সা শেষ করে দেয়। কাজেই সুযোগ বুঝে এখানে একটা মালয়ী অপেরা পার্টি এসে হাজির হল। এরা প্রত্যেক রাত্রিতে থিয়েটার দেখাতো। গ্রামবাসীদের ডুরিয়ান বিক্রীর পয়সা। সারাদিন ফল বিক্রি করে সারারাত বসে বসে অপেরা দেখতো। প্রথম কয়েক রাত বেশ ভিড় হয়। আমাদের অফিসারদের সকলকেই পাশ দিয়েছিলো। জাপানী অফিসার একদিনও যায়নি। আমি অবশ্য প্রায়ই সময় কাটাবার জন্য সেখানে যেতাম। এদের থিয়েটারের গল্পগুলি বেশীর ভাগই রামায়ণ ও মহাভারত থেকে সংগ্রহ করা। তবে অশ্লীলতা অনেকখানি আছে। আমাদের সিপাহীদের জন্য টিকিট ছিলো মাত্র দশ পয়সা, কাজেই বলা বাহুল্য, তারা পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারলেও রোজই বই দেখতে যেতো। অপেরার ম্যানেজার আবার মাঝে মাঝে আমাদের একটু সন্তুষ্ট করার জন্য দু' একটি হিন্দুস্থানী গান যোগ করে দিতো। একদিন আমি বসে বসে অপেরা দেখছি এমন সময় জাপানীর বাড়ির চীনা মেয়ে দু'টি এসে হাজির। আমার পাশের খালি চেয়ার

অধিকার করে বসলে—'কমবানওয়া' অর্থাৎ জাপানী প্রথায় সান্ধ্য অভিবাদন জানালে। দু'জনেই খুব সুন্দর, ইংরেজী বলতে পারে—সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ। জাপানীর কাছে থাকলেও জাপানীকে যে বিশেষ ভালো চোখে দেখে না, কথাবার্তায় তা, বেশ বুঝতে পারা গেলো। প্রায় সারারাত বসে বসে তারা অপেরা দেখলো আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঠোঙ্গা চীনাবাদামও শেষ করলে।

এইভাবেই আমার অভিনব বন্দীজীবন কাটছে। মাঝে মাঝে কাজের মধ্যে ডুবে থাকি কাজেই সব কিছু যাই ভুলে। আবার কখনও কোনো কাজ থাকে না, তখন নদীর তীরে চুপচাপ বসে বসে ভাবি নিজেরই জীবনের কাহিনী। অতীত জীবনের এক একটা পৃষ্ঠা উলটে দেখি সে জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনের কতোখানি পার্থক্য। ছেলেবেলায় কে একজন হাত দেখে বলেছিলো জীবনে আমার আছে সমুদ্রযাত্রা। সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, হয়তো "এস্ এস্ মহারাজ" চড়বার সৌভাগ্য কোন দিন হতেও পারে। আজ বাঙলা থেকে বহুদূরে বসে বসে সেই কথা মনে পড়ছে। বৃটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান বন্দীদের ইতিমধ্যে 'রেড ক্রসের' কৃপায় চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হচ্ছে। তাদের জন্য উপহার প্যাকেট পর্যন্ত আসছে অথচ গোলাম ভারতবাসীর জন্য কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। অনেকদিন থেকেই শুনছি ভারতীয় বন্দীদের জন্য খুব শীঘ্রই ডাক আসবে কিন্তু কৈ আজও তো তা' পৌছালো না। আর পৌছালেও

আমাদের কাছে তা পৌঁছাবে কিনা তাও সন্দেহের কথা। ভারতীয় বন্দীদের বহু ছোট বড় দলে বিভক্ত করে চারদিকে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্মা, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা এমন কি সুদূর সেলেবিস, টাইমুর ও নিউগিনি পর্যন্ত ভারত-বাসীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবর আর কে রাখে? শুনেছি জাপানীরা ব্যাঙ্কক থেকে মৌলমেন পর্যন্ত রেল লাইন তৈরী করছে, আর সেখানে অষ্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় বন্দী ও বহু তামিল কাজ করেছে। সেখানে নানা রকম অসুখে বহুলোক মারা যাচ্ছে।

একদিন জাপানী অফিসারের বাংলোতে বেশ মজার একটা ঘটনা ঘটে। এক সন্ধ্যায় জাপানী অফিসার এখানকার কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোককে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করে। জেলার অফিসার, পুলিশ অফিসার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রথম খানিকটা সুরা পরিবেষণ হল, তারপর খাদ্য। জাপানীদের খাওয়া খুবই সাধারণ ভাত, মাছ ও 'সুপ'। সেদিন জাপানী অফিসার বোতলের পর বোতল শেষ করে। ভোজ সভায় নানা রকম গল্প চলতে থাকে। তারপর সে শুরু করল তাদের তলোয়ারের কাহিনী। আমি এ কাহিনী বহুবার শুনেছি, কিন্তু এদের কাছে নূতন কাজেই সকলে বেশ আগ্রহ সহকারে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ জাপানী ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে তার তলোয়ারের কাহিনী বেশ ভালো করে বোঝাবার জন্য তার তলোয়ারটি খাপ থেকে খুলে বাইরে নিয়ে আসে।

ব্যস্ আর যাবে কোথায়? সকলেই বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। কোথায় রইল তাদের টুপি কোথায় বা জুতো আর কোথায় বা ছড়ি, প্রাণ নিয়ে সব উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। জাপানীও ঠিকমতো বুঝতে পারলে না যে ব্যাপারটা কি। কাজেই বাইরে বেরিয়ে এলো তাদের ডাকতে, হাতে কিন্তু সেই তলোয়ার কাজেই যাঁরা ঘরের বাইরে এসে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন তাঁরাও এবার ছুট্ লাগালেন। মুহূর্তে উধাও— থাকার মধ্যে শুধু আমি আর গজআলি। ঘরে ফিরে এসে জাপানী খুব একদম হেসে নিলে, বললে আমি তো শুধু একটু বোঝাবার জন্য তলোয়ার বার করেছি, তাতে এতো ভয় পাওয়ার কি আছে? আমরা বললাম কিছুদিন আগে চীনাটিকে মারার কথা ওরা আজও ভোলে নি, কাজেই বেশ খানিকটা মদ খাওয়ার পর জাপানীর হাতে খোলা তলোয়ার দেখে এমন কে বীর আছে যে ভয় পাবে না। নিতান্ত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত তাই ভয় পাই না, নইলে ঐ অবস্থায় আমরাও ঐ পথই অবলম্বন করতাম। অল্প পরে আমরাও বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে এক এক করে সকলেই আমার কাছে এসে হাজির, তাদের টুপি, জুতা ও ছড়ির জন্য। একটু ঠাট্টা করে বললাম, সেগুলি জাপানীই আটকে রেখেছে, তার কাছ থেকেই আপনাদের চেয়ে আনতে হবে। তারা ফিরে যেতে চায় দেখে তাদের সব জিনিস ফেরৎ দিলাম। ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের কাছে জাপানীর অতীত অভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি, কাজেই

ভদ্রলোক এবারও বিশেষভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এর পর অবশ্য আর কোন দিন কোনও ভোজের হাঙ্গামা হয়নি।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে বিশেষ কিছু কাজের জন্য জাপানী 'সাইনন' যেতে বাধ্য হয়। বার বার আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে বহু সাবধানবাণী শুনিয়ে আমাদের হাতে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জাপানী চলে গেলো। আমরাও কয়েকদিন বাঁধনহারা হয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটালাম। জাপানী না থাকাতে কামারিয়াও বেশ নির্ভয়ে সর্বদাই আমার কাছে যাতায়াত করতো আর তার বাড়ির তৈরী নানা রকম খাবার আমাকে রোজই খাওয়াতো। তারপর অপেরা তো আছেই। আমার সঙ্গে প্রায়ই অপেরা দেখতে যেতো।

আমার সাব অফিসার নয়নসুখের মস্তিষ্ক খারাপের লক্ষণ দেখা দিতে লাগলো। রোজই জপ, তপ শুরু করলে। মাঝে মাঝে উপবাস। আমি কারণ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে কিছুই জানালে না। কাজ কর্ম ঠিকই করতো তবু কখনো আপন মনে হাসতো, কখনো চুপচাপ বসে থাকতো। চীনাটিকে কাটার পর থেকেই তার এ পরিবর্তন শুরু হয়। মোটর সে খুবই ভালো চালাতে পারতো। মাথা খারাপ হলেও গাড়ি সে ঠিকই চালাতো। প্রথমে চুপচাপই থাকতো কিন্তু পরে গালাগালিও সুরু করলে। একদিন হঠাৎ আমার উপরে খুব রেগে পিস্তল নিয়ে আমাকেই আক্রমণ করতে আসে। ভাগ্যে পিস্তল খাপের ভিতর ছিলো কাজেই তাড়াতাড়ি তার

হাত চেপে সে যাত্রায় রক্ষা পাই। তারপর থেকে তাকে খালি পিস্তল দিয়েছিলাম, গুলী আমার বাক্স বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। আমার সিপাহীদেরও সাবধান করে দিয়েছিলাম তারা যেন তার হাতে কোনো হাতিয়ার না দেয়। তাকে সব সময়ে বুঝিয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করতাম। ইতিমধ্যে তার জ্বর হয় কাজেই সুযোগ বুঝে তাকে পাঠালাম এলোর স্টার হাসপাতালে।

দশদিন পরে জাপানী ফিরে আসে। এদিককার জানাবার মতো কোনও খবর ছিলো না একমাত্র নয়নসুখের কাহিনী ছাড়া। ফিরে আসার পর জাপানীকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেলো। আমাকে বললে আজ সন্ধ্যায় তোমাকে খুব সুখবর শোনাবো, আমার বাংলোতে এসো। সুখবর যে কি হ'তে পারে ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবু, অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই সন্ধ্যার পর জাপানীর বাংলোয় উপস্থিত হলাম।

খানিকক্ষণ গল্প করার পর জাপানী আমাকে পাঁচখানি চিঠি দিলে আমার বাড়ির। বললে, "তোমাদের ডাক এসেছে, আমি —আমাদের দলের যত্তোগুলি চিঠি পেয়েছি সবই এনেছি।" আমার ছাড়া অন্য সিপাহীদেরও কয়েকখানা চিঠি ছিলো। প্রায় দেড় বছর পর বাড়ির চিঠি পেলাম। যদিও চিঠিগুলি সাত আট মাস আগের লেখা—তবুও এতোদিন পরে বাড়ির চিঠি পেয়ে যে কতোটা শান্তি ও আনন্দ পেলাম—তা' ভাষায় জানানো অসম্ভব। চিঠিতে বিশেষ কিছু লেখা না থাকলেও শুধু কুশল

সংবাদটুকুই আজ যথেষ্ট। বাড়ি তো ছেড়েছি আজ তিন বছর, তবু যুদ্ধের আগে চিঠিপত্র পেতাম—মনের অনেকটা শান্তি ছিলো। দেশের যে অবস্থা খুবই খারাপ তা মাঝে মাঝে এদিককার খবরের কাগজে পড়তাম। কাজেই চিন্তা খুবই বেশী।

চিঠি লেখার জন্যও জাপানী অনেকগুলি রেডক্রস কার্ড এনেছে। তাতে সবকিছুই ছাপানো আছে—নীচে শুধু নামটি নিজের হাতে লিখে ঠিকানা লিখে দেওয়ার বাকী। অফিসারদের উপর নির্দেশ ছিলো তারা ইচ্ছা করলে আরও মাত্র চার লাইন এর সঙ্গে যোগ করে দিতে পারে অবশ্য আপত্তিকর যেন কিছু না লেখা হয়। চিঠি পাওয়ার চাইতে চিঠি পাঠানোর আমাদের বেশী দরকার। আত্মসমর্পণের পর আমরা কোনও খবর পাঠাতে পারি নি, কাজেই জীবিত কি মৃত সে খবরটুকুর জন্যে সকলেই নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত। তাই আজ চিঠি লেখবার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম এবং কষ্ট করে চিঠি ও কার্ডগুলি আমাদের জন্য আনার জন্য জাপানী অফিসারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। তারপর জাপানী অফিসার জানালে, "তোমাদের সুভাষচন্দ্র বসু সাইননে উপস্থিত হয়েছেন এবং 'ইণ্ডো-কেকো-মিনগুণ' অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন শুরু হয়েছে।"

একটি জাপানী কাগজে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী লেখা ছিলো সেটি তর্জমা করে আমাকে শোনালে। তিনি আফগান সীমান্তে উপস্থিত হলে সেখানকার সীমান্ত রক্ষী দল তাঁকে

গ্রেপ্তার করে, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে যা' কিছু ছিলো সব তাদের দিয়ে ছাড়া পান। তারপর রাশিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বার্লিনে উপস্থিত হন। সেখান থেকে তিনি টোকিওতে আসেন এবং বর্তমানে তিনি মালয়েতে উপস্থিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। হাসতে হাসতে জাপানী বললে, "আফগান সীমান্তে রক্ষীদের কাজের কিন্তু প্রশংসা করা যায় না। আমার রক্ষীদলের কেউ এরূপ ঘুষ নিয়ে লোক ছাড়লে আমি তাকে চরম শাস্তি দিতাম।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা সুভাষচন্দ্রের দলে যোগদান করতে চাও কিনা? উত্তরে জানালাম "আমরা সকলেই তাঁর দলে যোগদান করতে চাই।" জাপানী জানালে "আর দু'মাস পরেই আমরা আশা করছি যে; আমাদের মালয়ী পুলিশের শিক্ষা শেষ হবে, তারা এসে পড়লেই তোমাদের ছুটী। তোমরা বসুর দলে যোগদান করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করলে আমি সত্যই আনন্দিত হবো।' তারপর গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু, রাসবিহারী বসু প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হল। গান্ধীজী, নামের সঙ্গে জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। মুণ্ডিত মস্তক ও হাতে লাঠী—গান্ধীজীর এই ছবিটি প্রায় সব জাপানীই দেখেছে।

এই সময়ে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারল তোজো ও শ্যামরাজ্যের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিলো। শোনা গেলো, জাপানীরা মালয়ের উত্তরের চারিটি রাজ্য—কেডা,

ফেলাগুন, পারলিস ও ট্রানগানু—শ্যামরাজ্যকে ফেরত দিতে চায়। ওদিকে বর্মার সানরাজ্যেরও ছোট দুটি অংশ শ্যামরাজ্যকে দেওয়ার কথাবার্তা হয়। কেডা রাজা ১৯০৪ সালের আগে শ্যামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দিলে সীমান্তও অনেকখানি দক্ষিণে সরে যাবে—কাজেই আমাদেরও পিছু হঠতে হবে। তবে কবে নাগাদ ে ্ক হস্তান্তরিত হবে তার সঠিক খবর বার হয় নি।

আমাদের দিন ধারাবাহিকভাবেই কেটে চলেছে, নূতনত্ব কিছুই নেই! নয়নসুখ কয়দিন পরে হাসপাতাল থেকে ফেরত এসেছে। ইতিমধ্যে আমাদের কুলকারনি নামে একজন সিপাহী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে এলোর স্টার হাসপাতালে ভর্তি করার কয়েকদিন পরে তার মৃত্যুও হয়। তার ৃ দেহ আমরা লরী করে কৌলানারাও নিয়ে আসি! জাপানী বললে, "তোমরা মৃতদেহ কিভাবে সৎকার করো তা' আমরা জানি না, কাজেই তোমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সব কিছু করো, খরচ যা লাগে সব আমি বহন করবো! জিনিষপত্রের যা কিছু দরকার এখানকার চীনা কনট্রাকটরকে জানালে, সেই সবকিছু যোগাড় করে দেবে!" কাজেই এখানকার নদীতীরে আমরা চিতা সাজালাম। কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ চীনা কনট্রাকটরের কাছ থেকে ামা। ঘি মোটেই পাওয়া যায় না, তাই নারিকেল তেল নিলাম দু'টিন। তারপর সকল সিপাহীকে পুরো ইউনিফরম ও হাতিয়ার সমেত সেখানে জড় করে জাপানী অফিসারকে ডেকে পাঠালাম।

জাপানী অফিসার সমেত আমরা সকলে সামরিক কায়দায় অভি-বাদন করলাম। তারপর এক মিনিটকাল তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করার পর চিতায় আগুন দেওয়া হল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কুল-কারনির নশ্বরদেহ ভস্মে মিলিয়ে গেলো। আত্মীয়স্বজন থেকে বহুদূরে মালয়ের এক অখ্যাত পল্লীর নদীর তীরে তার শেষ সমাধি হল। এই তো মানবের শেষ পরিণতি। আজ তার বাড়ির কোন আত্মীয়ই জানতে পারিলে না তার এই অকাল মৃত্যুর খবর। কবে জানতে পারবে তাও জানি না। হয়তো তার বাড়ির সকলে আকুল আগ্রহে তার ফিরে আসার পথ চেয়ে দিনের পর দিন নীরবে অপেক্ষা করবে।

আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করে চলে এলাম। জাপানীরা যে মৃতদেহকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে তা আগেও দেখেছি। আমার সিপাহীদের ডেকে তাদের কাছে কুলকারনির অনেক প্রশংসা করলে। সে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার কর্তব্য যথা-রীতি পালন করেছে। সে সৈনিক ছিলো—কাজেই তার স্থান হবে স্বর্গে। জাপানীরা বিশ্বাস করে যারা যুদ্ধে মারা যায়, অথবা দেশের কাজে, কর্তব্য কাজে মারা যায় তারা মৃত্যুর পর অমর-লোকে দেবতার আসন পায়! এ ধারণা হয়তো সত্য হ'তেও পারে অথবা একেবারেই মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তবু, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বহু জাপানী যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরের মতো যুদ্ধ করে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে একথা সত্য। তাই তো

এদের সৈন্য দলের মধ্যে আত্মঘাতী সৈন্যদল আছে যারা সকলের আগে এগিয়ে যায় প্রাণ বিসর্জন দিতে।

জাপানী অফিসারটি তার পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য আমাদের সামনে খুব গম্ভীর হয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর সুন্দর গল্প হতো আমাদের মধ্যে। হাস্য, পরিহাসের কথাবার্তাও মাঝে মাঝে বেশ চলতো। একবার এখানে পুরাতন বাংলোর পাশে একটি বড় গাছ কাটা হচ্ছিলো। মিস্ত্রিরা কি কাজের জন্য ব্যস্ত থাকায় আমি বলেছিলাম, আমার সিপাহীরা এটা অনায়াসে কেটে ফেলতে পারে। জাপানী হাসতে হাসতে বললে, "হাঁ আমি তা' জানি। সিঙ্গাপুরে পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমরা বহু গাছ কেটে শেষ করেছ। একদিন আমাদের অফিসের সামনে অনেকগুলি হাঁস চরে বেড়াচ্ছিলো। দেখে জাপানী প্রথমে খুব একচোট হেসে নিলে, তারপর বললে —"আমরা তখন প্রথম সৈন্যদলে যোগদান করেছি। একটী গ্রামে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া জায়গাতে তাঁবু পড়েছে। আমরা বঁড়শীর মতো হুক তৈরী করে তাতে টোপ দিয়ে তারের বাইরে ফেলে দিতাম। হাঁস বা মুরগী সেই টোপ খাওয়া মাত্রই টেনে ভিতরে আনতাম। তারপর রাতারাতি সেগুলি কেটে সদ্ব্যবহার। শীতের দেশ, সারা রাতই ষ্টোভ জ্বলছে কাজেই রান্না করতেও বিশেষ কিছু বেগ পেতে হোত না। একদিন এই ভাবে মাংস রান্না হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ রাতের 'ডিউটী' অফিসার এসে উপস্থিত। এই সমস্ত ব্যাপার দেখে তিনি ভীষণ

রেগে খুব খানিকটা গালি দিলেন—তারপর ভবিষ্যতে যা'তে এরূপ ঘটনা না ঘটে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই মাংস উদরস্থ করলাম।"

এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পর, একদিন সন্ধ্যায় মনটা বড়ই খারাপ লাগছিলো। বার বার শুধু বাড়ীর কথাই মনে পড়ছিলো! সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সুদূর মালয়ের এক প্রান্তে আমি একা! একটী ছোট্ট "স্পোটিং সাইকেল" নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূর রাস্তার উপর ছোট্ট নদীর তীরে। পাশেই মালয়ীদের একটী কবর। সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে কয়েকটী শ্বেত স্মৃতি মর্মর শোভা পাচ্ছে। বহুদিন পূর্বে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে পড়েছি "অন্ধকারেরও একটী রূপ আছে।" কিন্তু তা' কোনদিন উপভোগ করি নি। আজ জীবনের এই অভিনব পরিবর্তনে, বাইরের কোলাহলের চাইতে, এই নীরব নির্জন নদীতীরই বেশ ভালো লাগলো। পাশেই ছোট্ট একটী পাহাড়ী নদী কল কল নাদে বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আলোকবিহীন দুটী সাইকেলের আওয়াজ পেলাম। প্রথমে ভাবলাম হয়তো কোনও চীনা দোকানী বাড়ী ফিরছে কারণ সন্ধ্যার পর ভুতের ভয়ে মালয়ীরা বড় একটা পথ চলে না। আমার আওয়াজ শুনে তারা নেমে এলো। দেখলাম, জাপানী অফিসারের বাড়ীর সেই চীনা তরুণী দুটী।

তারা আমাকে এই সময়ে এই স্থানে দেখে বেশ আশ্চর্য

হোল। তারপর খানিকক্ষণ গল্প হোল! দেখলাম, দু'জনেই বেশ সুন্দর ইংরেজী ও মালয়ী ভাষা বলতে পারে। একটী মেয়ের বাবা, বেশ বড় ইন্‌জিনিয়ার, বহু টাকার [illegible]ক, তবু তার মেয়ে যে কেন এই অবস্থায়, এখানে দিন কাটাচ্ছে সেটাই হচ্ছে আশ্চর্যের বিষয়। তার গভীর দুঃখের কাহিনী শুনলাম। ভাইকে জাপানীরা ধরে নিয়ে যায় জাপ-বি[illegible] 'কম্যুনিষ্ট' হিসাবে। ভাইয়ের প্রাণ সে ফিরিয়ে এনেছে নিজের দেহের বিনিময়ে। তাই আজ বাধ্য হয়েই তাকে এই কলঙ্কিত জীবন যাপন করতে হচ্ছে। তার কাহিনী শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে "বাসু সান, আজ, শুধু তোমাকেই জানালাম আমার জীবনের গোপন কাহিনী। অনেকেই আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু তবু তাদের ঘৃণা ও উপেক্ষা সহ্য করে বেঁচে থাকা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই। তবে অনুরোধ অন্য কাহাকেও জানিও না, আমার এই কাহিনী। কি জানি কেন আজ হৃদয়ের ব্যথা চেপে রাখতে পারলাম না বলেই তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললাম। ক্ষমা কোর।" বিদেশী আমি আর সেও বিদেশিনী, তবু অন্তর থেকেই তাকে জানালাম আমার সহানুভূতি। ফিরে এলাম নিজের ঘরে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কথা ভাবছিলাম, যে মেয়ে নিজের সর্বস্বদান করেছে ভাইয়ের প্রাণের জন্য। এর মধ্যে সে মহত্ব ফুটে উঠেছে তা' কয়জনে অনুভব করতে পারবে? যে শুধু একাই নয় এমনি ধারা অনেক গুলি চীনা মেয়ের দুঃখের কথা আমি অন্যের কাছেও শুনেছি।

কতোখানি ব্যথাভরা যে এদের হৃদয় তা অনুভব করতে পারি নিজেও ব্যথিত বলে।

কিছুদিন পরে 'জিত্রাতে' আমাদের যে একটী দল ছিলো তার থেকে প্রায় চল্লিশজন আমাদের দলে যোগদান করলে। শুনলাম মালয়ী পুলিশ এসেছে আর তারা 'জিত্রার' দিকে কাজ করবে। এই দলে চন্দ্রদীপ পাণ্ডে নামে একজন অফিসারও ছিলেন। চন্দ্রদীপ প্রায় তিরিশ বছর মিলিটারীতে কাজ করেছেন। সামান্য সিপাহী থেকে সুবেদারের পদে উন্নীত হয়েছেন। হিন্দি ছাড়া তিনি অন্য কোনও ভাষা জানতেন না, তা' ছাড়া সেখানে যে জাপানীর কাছে কাজ করতেন সেখানেও খুব ভালো ব্যবহার না পাওয়াতে জাপানীদের খুবই ভয় করতেন।

ইতিমধ্যে আমরা খবরের কাগজ মারফৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু কিছু খবর পেতে লাগলাম। "গান্ধী রেজিমেণ্ট" নামে বাহিনী ইতিমধ্যে 'জিত্রায়' ক্যাম্প করেছে। আগষ্টমাসে শুনলাম সুভাষচন্দ্র বসু হয়তো খুব শীঘ্রই 'এলোরষ্টার' আসবেন। আমি জাপানী অফিসারকে সেই কথা জানিয়ে তিনি এ'লে যাতে আমরা তাঁর সভায় যোগদান করতে পারি সেই অনুমতি প্রার্থনা করলাম। জাপানী সানন্দে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করলে। আমি এলোর ষ্টারের 'ইণ্ডিয়ান ইনডি-পেনডেন্স' লীগের সভাপতিকে জানিয়ে রাখলাম সুভাষচন্দ্র যে দিন এলোরষ্টারে আসবেন সে দিন যেন তিনি আগেই

আমাদের খবর দেন, কারণ আমাদের আসতে হবে একুশ মাইল দূর থেকে।

যেদিন নেতাজী স্বভাষচন্দ্র এলোরষ্টার এসে পৌছালেন, সেইদিন দুপুরেই আমরা খবর পেলাম যে বিকাল পাঁচটায় তিনি বক্তৃতা করবেন। আমরা নিতান্ত আবশ্যক মত কয়েকজন প্রহরী 'কৌলা নারাঙে' রেখে বেলা প্রায় তিনটার সময় লরীতে চড়ে এলোর ষ্টারে উপস্থিত হলাম। দুপুরের তীব্র রৌদ্র থাকা সত্ত্বেও বহু ভারতীয় ইতিমধ্যেই ময়দানে আপন আপন স্থান সংগ্রহ করে গভীর উত্তেজনার সঙ্গে অপেক্ষা করছে। ময়দানের চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য ভারতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা এবং জাপানীদের সূর্যমার্কা পতাকা শোভা পাচ্ছিলো। 'জিত্রা' থেকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও সিপাহী, নেতাজীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় নেতাজী "কেডার" জাপানী গভরনরের সঙ্গে ময়দানে উপস্থিত হয়ে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতা, "নেতাজীকী জয়" রবে ঘন ঘন চিৎকার ধ্বনিতে মত্ত হয়ে উঠ্‌লো! নেতাজী মঞ্চ থেকে নেমে এসে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন! তারপর জাতীয় বাহিনী পরিদর্শন করলেন! তার সঙ্গে জাপানী গভরনর, আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসার এবং নারী বাহিনীর কাপ্তেন লক্ষ্মীও উপস্থিত ছিলেন!

পরে মঞ্চের উপর উঠে তিনি বক্তৃতা সুরু করলেন

ইংরেজীতে। একজন তামিল, তামিল ভাষায় তার তর্জমা করে। বহুদিন বাদে আজ তাঁকে দেখলাম ও তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। মালয়ে আসার কিছুদিন বাদেই তাঁর অন্তর্দ্ধানের খবর কাগজে পড়েছিলাম, আজ চোখের সামনে তাঁকে দেখে যে কতোটা আনন্দিত হলাম, তা' জানাবার ভাষা নেই। তিনি বিশেষ করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জানান যে, তাঁরা যেন দেশের কাজে যথাসর্বস্ব দান করেন। অনেক ব্যবসায়ী নাকি তাঁকে বলেছেন যে তাঁদের অর্থের শতকরা পাঁচভাগ অথবা দশভাগ তাঁরা দান করতে পারেন। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে তাঁদের জানিয়ে দেন যে, দেশভক্ত তরুণেরা তাদের মূল্যবান প্রাণ দেশের জন্য অকাতরে দান করছে। তারাতো বলতে পারতো যে তাদের দেহের রক্তের শুধু দশভাগ তারা দান করবে দেশের জন্য। শেষে বিশেষ জোরের সঙ্গে তিনি বলেন, আমি ভারতীয়দের কাছ থেকে তাদের চরমদান চাই। যা' কিছু আছে তাই নিয়ে তোমরা এগিয়ে এসো—স্বাধীনতার দুর্গম পথের যাত্রী হও!" সভাভঙ্গের পর আমরা কৌলা নারাঙে ফিরে আসি। আমার সিপাহীরা সকলে জানায় যে তারা জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত। পরদিন জাপানী আমাকে জিজ্ঞাসা করে "চন্দ্র বোসের বক্তৃতা কেমন লাগলো?" আমি জানালাম জীবনে বহুবার তাঁর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তবে এখন আর বক্তৃতার সময় নেই, এখন হচ্ছে প্রকৃত কাজের সময়। তাই তিনিও এখন কাজ চান, আর চান প্রকৃত কর্মী।

—এই হচ্ছে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ—স্বাধীনতা লাভের! এই সুযোগ আবার হয়তো নাও আসতে পারে।" তারপর জানালাম, আমরাও ছাড়া পেলে, তাঁর দলে যোগদান করে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি! জাপানী বললে' "তোমরাও যোগদান করতে চাও শুনে আমি খুবই আনন্দিত! আমরাও ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চাই! তবে বর্তমানে তোমাদের ছাড়া অসম্ভব। তবে সুযোগ মতো তোমরা যা'তে জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করতে পারো সে চেষ্টা আমি করবো! we help Indians and Indians help us."

ধারাবাহিক ভাবে যেমন কাজ চলছিলো, তেমনি চলতে লাগলো। তবে আমাদের সকলের হৃদয়েই একটী আশা জেগে রইলো যে, এদের কাছ থেকে ছাড়া পেলেই, আমরা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করতে সমর্থ হবো! নেতাজীর যোগ্য নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দান করে আমরা ধন্য হ'তে পারবো! তবে এখনও কিছুদিন বন্দী জীবন যাপন করতে হবে। পাণ্ডে এখানে এসে যোগদান করলেও আমার কাজের কোনও লাঘব হোল না কারণ একে সে বৃদ্ধ তার উপর হিন্দি ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানে না! বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সেনাদল 'মেকানাইজড্'। নূতন বাহিনীতে যোগদান করার পর, কতো অসুবিধায় পড়তে হয়, পাণ্ডে মাঝে মাঝে তার কাহিনীও শুনাতো। একবার একজন অফিসার ষ্টেসনে 'ষ্টেসন ওয়াগন' পাঠাতে বলেছিলো পাণ্ডে তা

বুঝতে পারে নি, বেচারা ষ্টেসনে লরী পাঠিয়েছে 'বেইগণ' আনতে। সাহেব তো ষ্টেসনে পৌঁছে—তার গাড়ী না পেয়ে ক্ষেপেই আগুন। এমনিধারা অনেক মজার গল্প শুনতাম, পাণ্ডের কাছে।

মাঝে মাঝে আমাকে প্রায়ই ঘাঁটীতে যেতে হোত। প্রায় আট মাস কাজ করার পর, একদিন হিসাব করে দেখি, এ পর্যন্ত আমি যতোবার বাইরে যাতায়াত করেছি, তাতে প্রায় সব শুদ্ধ দেড়হাজার মাইল পথ আমাকে পায়ে হাঁটতে হয়েছে, ভালো রাস্তায় খুব বেশী কষ্টকর না হোলেও জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে এতোটা পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা যে কতোটা কষ্টকর ও বিপজ্জনক তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে উপলব্ধি করতে পারবেন না। তাই মাঝে মাঝে মনে হোত কোথায় বা বাংলার রাজধানী কলকাতা সহরের আরাম বিলাস—আর কোথায় এই মালয়ের বনজঙ্গল। এবার একবার পোষ্টে যাওয়ার পথে আমার জ্বর হয় এবং ফিরে আসার পর ম্যালেরিয়া বেশ কঠিনভাবেই আমাকে আক্রমণ করে। কয়েকদিন পরেই আরোগ্যলাভ করি, কিন্তু দুর্বলতা এতো বেশী যে এবার প্রায় একমাস আর বাইরে যেতে পারি নি। এদিকেও ক্রমশ জিনিষ-পত্রের দাম খুব বেশী বেড়ে যেতে লাগলো! বিশেষ করে কাপড় জামা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমরা এবিষয়ে জাপানী সৈন্যদের সব সুবিধাই ভোগ করতাম কাজেই আমাদের বিশেষ কষ্টভোগ করতে হয় নি, কিন্তু বেসামরিক লোকদের যথেষ্ঠ অসুবিধা ও কষ্টভোগ করতে হোত!

জাপানী সেনারা এ পথে বেশী যাতায়াত করতো না। আগে যে সমস্ত জাপানী সৈন্যদের পথে দেখেছিলাম, তাদের পোষাকের দৈন্যতাই, আগে নজরে পড়তো। এলোর ষ্টারে বহু জাপানী সৈন্য থাকতো। এদেরও দেখেছি সেই একই অবস্থা। জাপানী সিপাহীরা মাহিনা খুবই কম পায়। অফিসারদের মাহিনাও বৃটিশের তুলনায় একেবারেই নগণ্য! তবে মাহিনা কম হোলেও এরা অনেকগুলি সুবিধা পায়। দেশে পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সব কিছু ভার হচ্ছে জাতীয় গভরমেন্টের। জাপানী অফিসার প্রায়ই বলতো "—আমাদের দেশের লোকেরা দরিদ্র! আজ যদি আমাদের সৈন্যদের জন্য নিত্য নূতন পোষাক দিতে হয়, তা' হ'লে তার জন্য আমাদের দেশের বেসামরিক অধিবাসীদেরই কষ্ট পেতে হবে। আজ প্রায় বিশ বছর আগে থেকে জাপানীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানে রুগী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুরা ছাড়া অন্যে দুধটুকু পর্যন্ত পায় না। দেশের লোকেরা বহু কষ্টে যা' কিছু সংগ্রহ করছে তা' সবই এই বিরাট সৈন্য বাহিনীর জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। বৃটিশ অথবা আমেরিকার মতো এতো বড় সাম্রাজ্য বা অর্থ জাপানের নেই।" আর সেই জন্যই বহু উচ্চ পদস্থ জাপানী অফিসারকেও ছেঁড়া ও বহু তালি দেওয়া পোষাক ব্যবহার করতে দেখেছি। এতে তারা মোটেই লজ্জা পায় না বরং গৌরবই অনুভব করে। জাপানীদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা, পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের চাইতে বেশী। সামরিক শিক্ষা হচ্ছে বাধ্যতামূলক। প্রত্যেককেই জীবনে

একবার সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এমন কি এদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত তাদের স্কুলে সামরিক শিক্ষা লাভ করে। জাপানী অফিসার যখনই তার নিজের দেশের কথা বলতো তখনই সে বেশ গর্ব অনুভব করতো। এসিয়ার অন্যান্য যে কোনও জাতির চাইতে জাপানী সর্ব বিষয়ে উন্নত বলেই ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ তাদের বেশ ঈর্ষার চোখে দেখে। বৃটিশ জাতির নানা অন্যায় আব্দারের কথা শুনেই জাপানীরা বিশেষভাবে বৃটিশ বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলো। ভারতীয়দের জাপানীরা ঘৃণা করে না বরং তাদের মনে করুণার ভাবই উদয় হয়। তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, শিক্ষা, সভ্যতা ও বীরত্বে ভারতীয়রা বিশেষ উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন বৃটিশের পদানত ?

খবর শোনা গেল যে, ২০শে অক্টোবর থেকে মালয়ের চারিটি রাজ্য শ্যামের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। 'কেডা', 'পারলিস', 'কেলান্তন', ও 'ট্রানগানু', হচ্ছে এই রাজ্য চারিটি! 'কেডা' আগেও শ্যামের অন্তর্গত ছিলে। কিন্তু ১৯০৪ সালে মালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য অধিবাসীরা এ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত বলে মনে হোল না। তারা বরঞ্চ মালয়াতেই থাকতে চায়! আমরাও এখান থেকে যাওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই তৈরী হলাম! শুনলাম আপাততঃ এখান থেকে যাবো 'এলোরষ্টার'। সেখান থেকে একেবারে ইপো। আমাদের যে সকল সিপাহীরা ঘাঁটীতে ছিলো তাদের আস্তে আস্তে ফিরিয়ে আনা হোল। ক্রমে

আমাদের পুরো দলটী এখানে এসে উপস্থিত হোল। ঘরের যে সব কাঠের পার্টিশান দেওয়া হয়েছিলো, সেগুলিও ক্রমে ভেঙ্গে ফেললাম, কারণ এখানে কোন কিছুই আমরা রেখে যাবো না, সবই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আমরা চলে যাবো শুনে এখানকার সকলেই খুব দুঃখিত, ছোট কামারিয়াও আমরা চলে যাবো শুনে খুবই ব্যথা পেয়েছে। স্কুলে যাওয়া ছেড়েছে, ভালো করে খায় না, শুধু চুপচাপ বসে বসে আমাদের জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা দেখে। এখানকার অধিবাসীরা এক সন্ধ্যায় আমাদের একটী বিদায়ভোজে আপ্যায়িত করে। আমাদের কাজের ও ব্যবহারের জন্য সকলেই আমাদের ভালোবাসতো।

রোজ সকাল বেলা উঠেই আমরা যাওয়ার জন্য বিছানা বেঁধে তৈরী হয়ে থাকতাম, কিন্তু কয়েকদিন নানা কারণে যাওয়া ঘটে উঠে নি। ইতিমধ্যে মালয়ীদের 'হরিরায়া' উৎসব এসে পড়ে। এই দিনে মালয়ীরা নূতন পোষাক পরে। খাওয়া ও নানা উৎসবে মত্ত থাকে। অনেকগুলি বাড়ী থেকে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো কিন্তু এতোগুলি বাড়ীতে খাওয়া সম্ভবপর নয় বলেই কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নি। তবু কামারিয়ার বাড়ী থেকে অনেক রকম খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলো! ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নূতন পোষাক পরে মনের আনন্দে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেখে বার বার শুধু বাড়ীর ও দেশের কথাই মনে পড়ে। হয়তো পূজা এসে পড়েছে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে দেশে আজও কি আনন্দ উৎসব আছে? আর যদিও

একবার সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এমন কি এদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত তাদের স্কুলে সামরিক শিক্ষা লাভ করে। জাপানী অফিসার যখনই তার নিজের দেশের কথা বলতো তখনই সে বেশ গর্ব অনুভব করতো। এসিয়ার অন্যান্য যে কোনও জাতির চাইতে জাপানী সর্ব বিষয়ে উন্নত বলেই ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ তাদের বেশ ঈর্ষার চোখে দেখে। বৃটিশ জাতির নানা অন্যায় আব্দারের কথা শুনেই জাপানীরা বিশেষভাবে বৃটিশ বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলো। ভারতীয়দের জাপানীরা ঘৃণা করে না বরং তাদের মনে করুণার ভাবই উদয় হয়। তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, শিক্ষা, সভ্যতা ও বীরত্বে ভারতীয়রা বিশেষ উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন বৃটিশের পদানত ?

খবর শোনা গেল যে, ২০শে অক্টোবর থেকে মালয়ের চারিটি রাজ্য শ্যামের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। 'কেডা', 'পারলিস', 'কেলান্তন', ও 'ট্রানগানু', হচ্ছে এই রাজ্য চারিটি। 'কেডা' আগেও শ্যামের অন্তর্গত ছিলে। কিন্তু ১৯০৪ সালে মালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য অধিবাসীরা এ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত বলে মনে হোল না। তারা বরঞ্চ মালয়াতেই থাকতে চায়। আমরাও এখান থেকে যাওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই তৈরী হলাম! শুনলাম আপাততঃ এখান থেকে যাবো 'এলোরষ্টার'। সেখান থেকে একেবারে ইপো। আমাদের যে সকল সিপাহীরা ঘাঁটীতে ছিলো তাদের আস্তে আস্তে ফিরিয়ে আনা হোল। ক্রমে

আমাদের পূরো দলটী এখানে এসে উপস্থিত হোল। ঘরের যে সব কাঠের পার্টিশান দেওয়া হয়েছিলো, সেগুলিও ক্রমে ভেঙ্গে ফেললাম, কারণ এখানে কোন কিছুই আমরা রেখে যাবো না, সবই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আমরা চলে যাচ্ছি শুনে এখানকার সকলেই খুব দুঃখিত, ছোট কামারিয়াও আমরা চলে যাবো শুনে খুবই ব্যথা পেয়েছে। স্কুলে যাওয়া ছেড়েছে, ভালো করে খায় না, শুধু চুপচাপ বসে বসে আমাদের জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা দেখে। এখানকার অধিবাসীরা এক সন্ধ্যায় আমাদের একটী বিদায়ভোজে আপ্যায়িত করে। আমাদের কাজের ও ব্যবহারের জন্য সকলেই আমাদের ভালোবাসতো।

রোজ সকাল বেলা উঠেই আমরা যাওয়ার জন্য বিছানা বেঁধে তৈরী হয়ে থাকতাম, কিন্তু কয়েকদিন নানা কারণে যাওয়া ঘটে উঠে নি। ইতিমধ্যে মালয়ীদের 'হরিরায়া' উৎসব এসে পড়ে। এই দিনে মালয়ীরা নূতন পোষাক পরে। খাওয়া ও নানা উৎসবে মত্ত থাকে। অনেকগুলি বাড়ী থেকে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো কিন্তু এতোগুলি বাড়ীতে খাওয়া সম্ভবপর নয় বলেই কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নি। তবু কামারিয়ার বাড়ী থেকে অনেক রকম খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নূতন পোষাক পরে মনের আনন্দে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেখে বার বার শুধু বাড়ীর ও দেশের কথাই মনে পড়ে। হয়তো পূজা এসে পড়েছে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে দেশে আজও কি আনন্দ উৎসব আছে? আর যদিও

উৎসব থাকে, তবে হাজার হাজার ঘরে কি তাদের আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা আজ তাদের মনে অশান্তির সৃষ্টি করছে না? এখান থেকে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত কিন্তু লরীর অভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হলাম।

কয়েকদিন এইভাবে অপেক্ষা করার পর একদিন সন্ধ্যায় সত্যিই কতকগুলি লরী এসে হাজির হোল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য! আসবাবপত্র আমরা কিছুই ছাড়লাম না, কাজেই লরীর পর শুধু লরী ভর্তি হ'তে লাগলো টেবিল, চেয়ার ও আলমারীতে! সেই রাতেই আমরা আমাদের বন্দী জীবনের স্মৃতি বিজড়িত কৌলা নারাড ছেড়ে এলোর ষ্টারে রওনা হলাম! এসে-ছিলাম আমরা যাটজন, কিন্তু বিধাতার বিধান অনুযায়ী দু'জনকে এই দূর বিদেশের অজ্ঞাত পল্লীতে রেখে যেতে বাধ্য হলাম।

সে রাতটা আমরা এলোর ষ্টারে কাটালাম। রাতে কোনও কাজ ছিলো না, কাজেই দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেলাম। জাপানী বই, ভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য, তবে বেশ উপভোগ্য কাহিনী। জাপানীরা মালয়া জয় করার পর মাত্র কয়েক মাস ইংরেজী বই চলেছিলো, তারপর থেকে ইংরেজী বই একেবারে নিষিদ্ধ। পরদিন সকালে খাওয়া শেষ করে আমরা আবার লরীতে রওনা হলাম, সন্ধ্যায় পৌছলাম একেবারে "বুকিট মারতাজাম"। এখানেও কয়েকদিন থাকতে বাধ্য হলাম, তারপর পেরাক রাজ্যের 'ইপো' সহরে এসে পৌছলাম।

এখানকার 'চায়নিজ এসোসিয়েশন বিলিডিংএ' আমরা

থাকার জায়গা পেলাম! বিরাট তিনতলা বাড়ী। এখানে আমরা ছাড়াও স্পেশাল পুলিশ দল থাকতো! এই পুলিশ দলে একশো কুড়িজন মালয়ী, একশো কুড়িজন ভারতীয় থাকতো। আমরা আসার পর দুবেলা শুধু 'রোল কলে' হাজির হওয়া ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিলো না! কাজেই সন্ধ্যার পর সহরে বেড়াতে যেতাম।

যুদ্ধের আগে বৃটিশের আমলে এখানে একবার এসেছিলাম। সহরের অবস্থা প্রায় একই, তবে বর্তমানে পরিবর্তনের মধ্যে হচ্ছে শুধু এই যে পথে ও দোকানে অসংখ্য জাপানীর ভীড়। সহরে খুব বড় বড় কয়েকটী রেস্তোঁরা খোলা হয়েছে, আর চীনা, মালয়ী ও ইউরেসিয়ান তরুণীরা সেখানে পরিচারিকার কাজ করছে। সন্ধ্যার পর বড় বড় কাফেতে বাজনা বাজে, অসংখ্য জাপানী সেনারা ভীড় করে। সিঙ্গাপুরের মত বড় বড় প্রমোদ উদ্যান, এখানে না থাকলেও ছোট একটী উদ্যান আছে। সেখানে নাচ, গান, সিনেমা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি সব কিছুই লেগে আছে। জাপানীরা আসার পর আমোদ প্রমোদ যেন আরও অনেক বেড়ে গেছে! যুদ্ধ এদিকে শেষ হয়েছে অনেকদিন আগে, কাজেই এক মাত্র 'রেশনের' অসুবিধা ছাড়া সকলেই নির্ভয়ে বিচরণ করছে। ইতিমধ্যে অনেকেই বেশ ভালোভাবে জাপানীভাষা শিক্ষা করেছে, কাজে কাজেই ভাষাগত পার্থক্যের জন্য যে অসুবিধা ও দুর্ব্যবহার জাপানীর কাছে আগে পেতে হোত তা অনেক কমে গেছে! সন্ধ্যার পর আমি এবং গজআলী প্রায় প্রত্যহই এই

উৎসব থাকে, তবে হাজার হাজার ঘরে কি তাদের আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা আজ তাদের মনে অশান্তির সৃষ্টি করছে না? এখান থেকে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত কিন্তু লরীর অভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হলাম।

কয়েকদিন এইভাবে অপেক্ষা করার পর একদিন সন্ধ্যায় সত্যই কতকগুলি লরী এসে হাজির হোল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসবাবপত্র আমরা কিছুই ছাড়লাম না, কাজেই লরীর পর শুধু লরী ভর্তি হ'তে লাগলো টেবিল, চেয়ার ও আলমারীতে। সেই রাতেই আমরা আমাদের বন্দী জীবনের স্মৃতি বিজড়িত কোলা নারাঙ ছেড়ে এলোর ষ্টারে রওনা হলাম। এসে-ছিলাম আমরা যাটজন, কিন্তু বিধাতার বিধান অনুযায়ী দু'জনকে এই দূর বিদেশের অজ্ঞাত পল্লীতে রেখে যেতে বাধ্য হলাম।

সে রাতটা আমরা এলোর ষ্টারে কাটালাম। রাতে কোনও কাজ ছিলো না, কাজেই দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেলাম। জাপানী বই, ভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য, তবে বেশ উপভোগ্য কাহিনী। জাপানীরা মালয়া জয় করার পর মাত্র কয়েক মাস ইংরেজী বই চলেছিলো, তারপর থেকে ইংরেজী বই একেবারে নিষিদ্ধ। পরদিন সকালে খাওয়া শেষ করে আমরা আবার লরীতে রওনা হলাম, সন্ধ্যায় পৌছলাম একেবারে "বুকিট মারতাজাম"। এখানেও কয়েকদিন থাকতে বাধ্য হলাম, তারপর পেরাক রাজ্যের 'ইপো' সহরে এসে পৌছলাম।

এখানকার 'চায়নিজ এসোসিয়েশন বিলিডিংএ' আমরা

থাকার জায়গা পেলাম। বিরাট তিনতলা বাড়ী। এখানে আমরা ছাড়াও স্পেশাল পুলিশ দল থাকতো। এই পুলিশ দলে একশো কুড়িজন মালয়ী, একশো কুড়িজন ভারতীয় থাকতো। আমরা আসার পর হুবেলা শুধু 'রোল কলে' হাজির হওয়া ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিলো না। কাজেই সন্ধ্যার পর সহরে বেড়াতে যেতাম।

যুদ্ধের আগে বৃটিশের আমলে এখানে একবার এসেছিলাম। সহরের অবস্থা প্রায় একই, তবে বর্তমানে পরিবর্তনের মধ্যে হচ্ছে শুধু এই যে পথে ও দোকানে অসংখ্য জাপানীর ভীড়। সহরে খুব বড় বড় কয়েকটী রেস্তোঁরা খোলা হয়েছে, আর চীনা, মালয়ী ও ইউরেসিয়ান তরুণীরা সেখানে পরিচারিকার কাজ করছে। সন্ধ্যার পর বড় বড় কাফেতে বাজনা বাজে, অসংখ্য জাপানী সেনারা ভীড় করে। সিঙ্গাপুরের মত বড় বড় প্রমোদ উদ্যান, এখানে না থাকলেও ছোট একটী উদ্যান আছে। সেখানে নাচ, গান, সিনেমা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি সব কিছুই লেগে আছে। জাপানীরা আসার পর আমোদ প্রমোদ যেন আরও অনেক বেড়ে গেছে। যুদ্ধ এদিকে শেষ হয়েছে অনেকদিন আগে, কাজেই এক মাত্র 'রেশনের' অসুবিধা ছাড়া সকলেই নির্ভয়ে বিচরণ করছে। ইতিমধ্যে অনেকেই বেশ ভালোভাবে জাপানীভাষা শিক্ষা করেছে, কাজে কাজেই ভাষাগত পার্থক্যের জন্য যে অসুবিধা ও দুর্ব্যবহার জাপানীর কাছে আগে পেতে হোত তা অনেক কমে গেছে। সন্ধ্যার পর আমি এবং গজআলী প্রায় প্রত্যহই এই

পার্কের খোলা কাফেতে বসে কফির পর কফি ধ্বংস করতাম, আর নানাদেশীয় জনতার চাল চলন ও এখানকার আমোদ প্রমোদ উপভোগ করতাম।

এখানকার স্পেশাল পুলিশের কাজ ছিলো, জাপানী বিরোধী চীনাদের ওপর নজর রাখা, সন্দেহক্রমে তাদের ধরে আনা ও শাস্তি দেওয়া। কাজটী খুবই কঠিন ও বিপদজনক কারণ প্রত্যেক চীনাই হচ্ছে জাপানী বিরোধী, অবশ্য বাইরের ব্যবহারে সব সময় ধরা পড়া সম্ভবপর নয়। প্রায়ই গুপ্তহত্যা হোত, বাইরের পথে যখনই বড় বড় জাপানী অফিসাররা চলাফেরা করতো তখন তাদের সাহায্য করার জন্য লরী ভর্তি পুলিশদল যেতো। আমাদের সাধারণতঃ বাইরে পাঠানো হোত না। আমরা এখানে এসে পৌঁছানর পরই আমাদের সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজে পাঠানোর জন্য বার বার জাপানীদের কাছে আবেদন করি, কিন্তু তারা বার বারই বলতো অল্পদিন পরেই তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বাধ্য হয়েই স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন ডেন্স লীগের সভাপতি মিঃ পালের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বন্দোবস্ত করার জন্য অনুরোধ করি, এবং আমাদের আবেদন যাতে সোজা একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারে সেই ব্যবস্থা করি। এইভাবে আরও কিছুদিন এখানে কেটে যায়।

একুশে অক্টোবর তারিখে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ গভরমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপরই আবার আমরা জাপানীদের

হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করি, এবার দেখা গেলো জাপানীদের সুর খুবই নরম এবং খুব শীঘ্রই আমাদের সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেবে বললে। এখানে শাক শব্জী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও চা'ল খুবই কম ছিলো। আমরা মাত্র এক পাউণ্ড হিসাবে চা'ল পেতাম। কয়েকবার জাপানীকে জানানো সত্বেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি, কাজেই খুব বেশী শাক শব্জী খেয়ে পেট ভরানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মাছের দাম বেশী, কাজেই তা বেশী পাওয়া যেতো না। আমার সিপাহীরা জাপানীর অধীনে আর একদিনও কাজ করতে রাজী নয়। তারা বললে, আমরা আস্তে আস্তে পালিয়ে যাবো। তাদের অনেক বুঝিয়ে আরও কয়েকদিন চুপচাপ থাকার জন্য অনুরোধ করলাম।

নভেম্বর মাসের আট তারিখে সকালেই খবর পেলাম আমাদের সিঙ্গাপুর যাওয়ার হুকুম হয়েছে! তখনও 'ক্রো'তে' ইন্দর সিংএর দল কাজ করছে তাদের শীঘ্র ফেরত আসার জন্য হুকুম দেওয়া হোল। পরদিন বিকালে তারা সদল বলে এসে হাজির হোল। আবার অনেকদিন পরে আমরা মিলিত হলাম। এবার সবশুদ্ধ আমরা প্রায় দু'শো জন হলাম। আবার অনেক দিন পরে দেখা, কাজেই অনেক সুখ দুঃখের গল্প হোল! হিসাব করে দেখলাম পথের নানা অসুবিধা ভোগ করা ছাড়া জাপানীদের ব্যবহার আমাদের দলেই সব চেয়ে ভালো ছিলো। অন্যান্য দলের ঘাঁটী রাস্তার কাছা-

পার্কের খোলা কাফেতে বসে কফির পর কফি ধ্বংস করতাম, আর নানাদেশীয় জনতার চাল চলন ও এখানকার আমোদ প্রমোদ উপভোগ করতাম।

এখানকার স্পেশাল পুলিশের কাজ ছিলো, জাপানী বিরোধী চীনাদের ওপর নজর রাখা, সন্দেহক্রমে তাদের ধরে আনা ও শাস্তি দেওয়া। কাজটী খুবই কঠিন ও বিপদজনক কারণ প্রত্যেক চীনাই হচ্ছে জাপানী বিরোধী, অবশ্য বাইরের ব্যবহারে সব সময় ধরা পড়া সম্ভবপর নয়। প্রায়ই গুপ্তহত্যা হোত, বাইরের পথে যখনই বড় বড় জাপানী অফিসাররা চলাফেরা করতো তখন তাদের সাহায্য করার জন্য লরী ভর্তি পুলিশদল যেতো। আমাদের সাধারণতঃ বাইরে পাঠানো হোত না। আমরা এখানে এসে পৌছানর পরই আমাদের সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজে পাঠানোর জন্য বার বার জাপানীদের কাছে আবেদন করি, কিন্তু তারা বার বারই বলতো অল্পদিন পরেই তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বাধ্য হয়েই স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন ডেন্স লীগের সভাপতি মিঃ পালের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বন্দোবস্ত করার জন্য অনুরোধ করি, এবং আমাদের আবেদন যাতে সোজা একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌছাতে পারে সেই ব্যবস্থা করি। এইভাবে আরও কিছুদিন এখানে কেটে যায়।

একুশে অক্টোবর তারিখে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ গভরমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপরই আবার আমরা জাপানীদের

হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করি, এবার দেখা গেলো জাপানীদের সুর খুবই নরম এবং খুব শীঘ্রই আমাদের সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেবে বললে! এখানে শাক শবজী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও চা'ল খুবই কম ছিলো। আমরা মাত্র এক পাউণ্ড হিসাবে চা'ল পেতাম। কয়েকবার জাপানীকে জানানো সত্ত্বেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি, কাজেই খুব বেশী শাক শবজী খেয়ে পেট ভরানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। মাছের দাম বেশী, কাজেই তা বেশী পাওয়া যেতো না। আমার সিপাহীরা জাপানীর অধীনে আর একদিনও কাজ করতে রাজী নয়। তারা বললে, আমরা আস্তে আস্তে পালিয়ে যাবো। তাদের অনেক বুঝিয়ে আরও কয়েকদিন চুপচাপ থাকার জন্য অনুরোধ করলাম।

নভেম্বর মাসের আট তারিখে সকালেই খবর পেলাম আমাদের সিঙ্গাপুর যাওয়ার হুকুম হয়েছে! তখনও 'ক্রো'তে' ইন্দর সিংএর দল কাজ করছে তাদের শীঘ্র ফেরত আসার জন্য হুকুম দেওয়া হোল। পরদিন বিকালে তারা সদল বলে এসে হাজির হোল। আবার অনেকদিন পরে আমরা মিলিত হলাম। এবার সবশুদ্ধ আমরা প্রায় দু'শো জন হলাম। আবার অনেক দিন পরে দেখা, কাজেই অনেক সুখ দুঃখের গল্প হোল! হিসাব করে দেখলাম পথের নানা অসুবিধা ভোগ করা ছাড়া জাপানীদের ব্যবহার আমাদের দলেই সব চেয়ে ভালো ছিলো। অন্যান্য দলের ঘাঁটী রাস্তার কাছা-

কাছি থাকাতে পায়ে হাঁটার কষ্ট তাদের ভোগ করতে হয় নি সত্য কিন্তু জাপানীদের ব্যবহার খুব ভালো ছিলো না। দু' একটা চড় চাপড় প্রায় অনেককেই হজম করতে হয়েছে। তাদের কাহিনী শুনে, আমরাও আমাদের কাহিনী শুনালাম। আমারা সকলেই খুব আনন্দিত হলাম, যে এবার আমাদের বন্দীত্ব ঘুচবে খুব শীঘ্রই এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করবো আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রজা হিসাবে। দশ তারিখেই আমাদের এখান থেকে রওনা হতে হবে কাজেই ন' তারিখের রাতে আমরা নিজেদের মধ্যে একটী প্রীতিভোজের আয়োজন করলাম। আমাদের প্রত্যেকেই আনন্দিত এবার আমাদের বন্দীত্বের মুক্তি। এবার আমরা সুযোগ পাবো দেশ মাতৃকার সেবা করবার জন্য।

দশ তারিখে কোন কারণে আমাদের যাওয়া হয়ে উঠ্‌লো না। এগারোই নভেম্বর রাতে আমরা সদলবলে ইপো ষ্টেশনে হাজির হলাম। আমাদের জন্য কতকগুলি মালগাড়ীর ডাব্বা তৈরী ছিলো তারই এক একটীতে আমাদের পঁচিশ জনের স্থান। জাপানীরা অবশ্য আমাদের বিদায় দিলো না, কয়েকজন আমাদের সঙ্গে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত চললো। তেরো তারিখে ভোর-বেলা আমরা 'সাইনন' ষ্টেশনে পৌঁছলাম। আমরা আস্‌ছি এ খবর জাপানীরা আগে থেকেই জানিয়েছে কাজেই ষ্টেশনে আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে অনেকগুলি লরী নিয়ে একজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। জাপানীরা এখান থেকেই

বিদায় নিলো। আমরা লরীতে চড়ে সোজা হাজির হলাম 'নিশুন ক্যাম্পে'। এখানে বহু পরিচিত পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোল, তারা 'জয় হিন্দ' অভিবাদনে আমাদের অভ্যর্থনা করলে।

আমাদের কাহিনী শোনার জন্য সকলেই খুব আগ্রহ প্রকাশ করলে। এবার আমরা আজাদ হিন্দ ক্যাম্পে প্রবেশ করে সত্যই নিজেদের ধন্য মনে করলাম। প্রত্যেকের কণ্ঠে উচ্চারিত সুদীপ্ত "জয় হিন্দ" আমাদের প্রাণেও জাগিয়ে তুললে, নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা।

"জয় হিন্দ"